প্রথম অধ্যায় : - প্রাক্ - আধুনিক বাংলা কাব্যের ভাষার ঐতিহ্য এবং ঈশ্বর - গুপ্তের ওপর তার প্রভাব ।

ঈশ্বরগুপ্ত রায় গুনাকর ভারতচন্দ্রের কাব্য - ভাষা দ্বারা বহুল পরিমানে প্রভাবিত হয়েছিলেন । ভারতচন্দ্র ছিলেন মধ্যযুগের বাংলাদেশের শেষ প্রতিনিধিস্থানীয় কবি । অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইনি বাংলাদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন । সেই সময় থেকে ঈশ্বরগুপ্তের সময় পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রভাব বিদ্যমান ছিল । ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত এই প্রতিভাবান কবিরই শেষ সার্থক প্রতিনিধি । ভারতচন্দ্রের মতই ঈশ্বরগুপ্তের মধ্যে ছিল মধ্যযুগীয় ভাব প্রাচুর্য ।

সম্ভবত : ১৭০৫ - ১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময় ভুরসুট পরগণার পেঁড়ো গ্রামের এক জমিদার বংশে ভারতচন্দ্রের জন্ম হয় । পিতার নাম নরেন্দ্র রায় । বর্ধমান রাজার রোষে নরেন্দ্র নারায়ন সর্বস্বান্ত হল । তারপর ভারত চন্দ্রকে বাধ্য হয়ে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হতে হয় । অল্প বয়সেই তিনি একদিকে সংস্কৃত অন্যদিকে ফারসী ভাষাতে সুদক্ষ হয়ে ওঠেন । তিনি অভিজাত বংশের সন্তান হলেও সারাজীবন ধরে দুঃখের সঙ্গে যুঝে চলেছেন । দারিদ্র - পীড়িত কবি নিজের পছন্দমত বিয়ে করে আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা পরিত্যক্ত হন । তারপর বর্ধমানে ভাগ্যান্বেষণে গেলে সেখানে কারারুদ্ধ হন । সেখান থেকে তিনি পুরীধামে পালিয়ে আসেন এবং বৈষ্ণবদের মধ্যে বাস করতে থাকেন । পরে নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের পর তিনি আবার নিজ বাসভূমিতে ফিরে এসে পরিবারের সঙ্গে মিলিত হন । তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁর মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন এবং তাঁকে মূলাজোড় গ্রাম দান করেন । দুর্ভাগ্য তাঁকে এখানেও ছায়ার মত অনুসরন করতে থাকে । জমিদারের এক অসাধু কর্মচারীর প্রকোপে পড়ে তাঁকে ভিটেমাটি ছাড়ার উদ্যোগ করতে হয় তবে সৌভাগ্যবশত:

তাঁকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হয় নি । অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ভারতচন্দ্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বারা রায় গুণাকর উপাধিতে ভূষিত হন ।

" অন্নদামঙ্গল " ই ভারতচন্দ্রের কবি প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচায়ক । নিজ সম্পর্কে তিনি বলেছেন , " ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে " । কৈশোর ও যৌবনেই তাঁর কবি প্রতিভা যৎকিঞ্চিৎ রচনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল । তাঁর প্রথম রচনা 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'। অনেকটা মঙ্গলকাব্যের ধরণের । এছাড়া তাঁর " রসমঞ্জরী " এবং বিচ্ছিন্ন গীতিকবিতা ধরণের কয়েকটি গান ও কবিতা উল্লেখযোগ্য । পরবর্তীকালে তাঁর গীতিকবিতা - গুলির দ্বারা কবিওয়ালা , টপ্পাগায়ক এবং ঈশ্বরগুপ্ত বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন । মাইকেল মধুসূদন দত্ত , যিনি ভারতচন্দ্রের প্রভাব থেকে বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধার করার জন্য লেখনী চালনা করেছিলেন , তিনিও অজ্ঞাতসারে কোথাও কোথাও ভারতচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন ।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল " কাশীখন্ড " নামক সংস্কৃত পুরাণশ্রেণীর রচনা অবলম্বনে লেখা হলেও তাতে মৌলিকতার বিশেষ সাক্ষর আছে । এর তিনটি খন্ড — (১) অন্নদা - মঙ্গল (২) অন্নপূর্ণামঙ্গল বা মানসিংহ (৩) কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর , দেবী - মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য কবি এই কাব্যত্রয় রচনা করেন । মঙ্গলকাব্যের শেষ উদাহরণ এই কাব্যত্রয় । যদিও কবি এখানে মঙ্গলকাব্যের বাঁধা পথ থেকে অনেক দূর দিয়ে বিচরণ করেছেন ।

অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যের জন্য ভারতচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এবং কাব্যরসিক সমাজে আজও অটুট মহিমায় বিরাজ করছেন । জীবনের গভীরতা , বেদনা ও দুঃখের ব্যাপারকে তিনি হাস্যকৌতুক রসে সরস করে তুলেছেন । হাস্যরসই তাঁর প্রধান সম্পদ ।

তাঁর কোন কোন রচনায় স্থূলতা থাকলেও কোথাও গ্রাম্যতা দোষ নেই । ভাষার মার্জিত অলংকার , দেশীয় শব্দ এমন কি ফারসি শব্দও তিনি ব্যবহার করেছেন । তিনি বিশ্বাস করতেন , " যে হৌক সে হৌক ভাষা , কাব্যরস লয়ে " । বিশেষ কোন মৌলিক চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেন নি । উচ্চস্তরের মহৎ আদর্শও সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না । তিনি ছিলেন নাগরিক জীবন ও রাজসভার কবি । মার্জিত চাঁছাছোলা উজ্জ্বল ভাষা-ভঙ্গিমা সৃষ্টি তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল । স্নিগ্ধ মধুর রচনাও তাঁর লেখনী থেকে বের হয়েছে । —

ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে ।

এই স্নিগ্ধ গীতিকবিতার সুর পরবর্তী কালের শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্যকে স্মরণ করিয়ে দেয় ।

ভারতচন্দ্রের সর্বাধিক সাফল্য রূপলোক নির্মানে । শব্দ , ছন্দ , অলংকার ও বাগ্‌রীতির সমাহারে তিনি এই রূপলোক নির্মাণ করেছেন । ভারতচন্দ্র " অন্নদামঙ্গল " , রসমঞ্জরী , " বিদ্যাসুন্দর " , " চোর পঞ্চাশিক " এবং " মানসিংহ " প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন । সেকালের রাজনৈতিক , সামাজিক , ধর্মনৈতিক পরিবেশ এবং কবির ব্যক্তি-জীবনের তথ্যানুসন্ধান করলে কবির মনোভূমি আবিষ্কার করা যায় । আঠারো শতকের বাংলা দেশের বিপর্যস্ত অবস্থা , মোঘল সাম্রাজ্যের পতন সৃষ্টির জীবন নাশেরই তুল্য । অরাজকতা এবং অতিরাজকতায় দেশে প্রজাদের নাভিশ্বাস উঠেছে । দেশে কেবল অন্নের নয় , প্রাণেরও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে । এমনই সময়ে স্থানীয় প্রধানদের কোলাহল আর অত্যাচারের মধ্যে প্রজাদের মন অব্যাহতি কামনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে । সেই সময় শোনা গিয়েছে নতুন এক

শক্তির পদধ্বনি যার আঘাতে মুসলমান রাজাদের অপসারন এবং তার প্রশ্রয়ে হিন্দুর চোখে রাজ্যগড়ার স্বপ্ন । এই যুগেরই কবি ভারতচন্দ্র । তাঁর জীবন কাহিনীর স্বল্প পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর " আত্মকথন ও ভনিতা " , " নাগাষ্টক " ও " বাসনা " প্রভৃতি কবিতায় ।

মনে রাখতে হবে যে কবির আসলরূপ ফোটাতে গিয়ে আমরা যেন তাঁর সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা না করি । " বিদ্যাসুন্দর " কাব্যে ভারতচন্দ্র নিশ্চয়ই অশ্লীলতার প্রশ্রয়দানকারী সমাজদূষণ কবি । তাঁর কবিত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকলেও তাঁর অশ্লীলতাকে স্বীকার করে নিতে হবে । বর্ণনীয় বস্তু বা ভাবকে তিনি স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলেছেন বলেই তাঁর কাব্যে অশ্লীলতা প্রকট ভাবে দেখা দিয়েছে । ভারতচন্দ্র ক্ষেত্রবিশেষে যা বর্ণনা দিয়েছেন তার অনুভূতিকে প্রকাশ্য উপভোগ করতে বাধে । ভারতচন্দ্রের কবি - ভাষা ভোগাচ্ছন্দকে উত্তাল করে পাঠক হৃদয়কে অসহ্য আবেগে মথিত করেছে । ভোগকে ত্যাগে মহিমান্বিত করে যে বিরহ , ভারতচন্দ্রে সে বিরহ নেই , আছে ভোগ বিরতিজনিত আক্ষেপ ।

" অন্নদামঙ্গল " ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত কাব্য । কাব্যটি ৩টি খন্ডে বিভক্ত , প্রথম খন্ডে বন্দনা , গ্রন্থসূচনা , কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন ইত্যাদির পরে গীত আরম্ভ হয়েছে । মাতৃরূপিনী দেবী অন্নপূর্ণার মহিমা বর্ণিত হয়েছে পৌরাণিক কাহিনীর মাধ্যমে । এখানে পাওয়া যায় দক্ষযজ্ঞ ও সতীর দেহত্যাগ , উমারূপে পুণর্জন্ম , হর গৌরীর বিবাহ ও গার্হস্থ্য জীবন , দেবীর অন্নপূর্ণা মূর্তি পরিগ্রহন , বিশ্বকর্মা কর্তৃক অন্নপূর্ণার পুরী নির্মাণ , কাশী মাহাত্ম্য , ব্যাসকাশী কথা ইত্যাদি । পরবর্তী অংশে দেবী অন্নপূর্ণার কৃপায় দরিদ্র কায়স্থ বিষ্ণুহোড়ের ও পুত্রলাভ , দেবীর বরপুত্র হরিহোড় কর্তৃক পিতার দারিদ্র মোচন , দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মোহ প্রভাবে অধঃপতন ও অশান্তি , দেবী-কর্তৃক হরিহোড়ের গৃহত্যাগ ও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব-পুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের ভবনে যাত্রা ইত্যাদি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে ।

দ্বিতীয় খন্ড আরম্ভ হয়েছে মানসিংহের বর্ধমান আগমনে এবং তৃতীয় খন্ড হ'ল "মানসিংহ" বা "অন্নপূর্ণামঙ্গল"।

এই কাব্যে আমরা দেখি ভক্তিরসের বদলে আদিরসের প্রাধান্য। আবেগের বদলে বুদ্ধির সচেতন প্রয়োগ। ভারতচন্দ্র যে যুগ পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাতে দেবদেবীর প্রতি অচলা ভক্তি বজায় রাখা বেশ কঠিন ছিল। রাজসভার বিলাস-ব্যসন সমৃদ্ধ নাগরিক পরিমন্ডল ও তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। জীবনের বেদনা, করুণ, গভীরতা এসবের চেয়ে ব্যঙ্গ পরিহাসময় লঘু দিকটি তাঁকে বেশী আকর্ষণ করেছিল।

তাঁর কাব্যে মাঝে মাঝে রুচি বিকৃতি লক্ষ্য করা গেছে, বিশেষত: "বিদ্যাসুন্দর" কাব্যে। এই রুচি বিকারকে কবি অপূর্ব বাক্‌চাতুর্যের দ্বারা শালীন করে তুলেছেন। এই শালীণতাবোধ নাগরিক রুচিরই পরিচায়ক। যেমন –

সুন্দরের গান শুনি সুন্দরী মোহিনা।
মিশায়ে বীনার সুরে গাহিতে লাগিনা ।।
দু'জনের গানেতে মোহিত দুই জন।
আলিঙ্গন প্রেমরসে মাতিল মদন ।।
কামমদে মাতান দেখিয়া দুই জনে।
যন্ত্র - তন্ত্র ফেলায়ে পলায় সখীগণে ।।

(বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকারম্ভ)

এই বিকৃত রুচিরই নিদর্শণ পাই আমরা ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় । যেমন —

যুবকের কত সুখ যুবতীর কোলে ?
কত বা অমৃত আছে বালকের বোলে ?

(হেমন্তে বিবিধ খাদ্য)

মধ্যযুগীয় ভাবধারা আমরা ঈশ্বরগুপ্তের ভিতর লক্ষ্য করি, এই ভাবধারা ভারতচন্দ্রেও ছিল । কেবল মনোবৃত্তির দিক থেকে নয় রুচির দিক দিয়েও ঈশ্বরগুপ্ত ছিলেন ভারতচন্দ্রের উপযুক্ত শিষ্য । কাব্য - সৌকর্য, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য, গীতিকাব্য সুলভ সুষমার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মেলে ভারতচন্দ্রের সাহিত্যে । ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্যে এর সাম্য নেই । ভারতচন্দ্রের বিকৃত রুচি ও সামাজিক ব্যঙ্গ ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যে আছে ভুরি ভুরি । কোন কোন স্থানের এই বিকৃত ভাষাকে পরবর্তী সংস্করণে বাদ দিতে হয়েছে শালীনতার জন্য । রসাত্মক ও রুচিবিকৃতির পরিচয় মেলে সামাজিক কবিতাগুলিতেই বেশী । 'বড়দিন', 'বিধবা - বিবাহ', 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' ও 'স্নানযাত্রা' প্রভৃতি কবিতা বিকৃত রুচিরই নিদর্শন । ভারতচন্দ্রের কাব্যে সৌন্দর্যের পরিচয় ও গীতিকাব্যসুলভ সুষমা থাকায় তাঁর ব্যঙ্গ কবিতাগুলি সাধারণের দৃষ্টিকে আঘাত করে না, অপরদিকে ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় গীতি কবিতার স্পর্শ না থাকায় তাঁর কবিতাগুলিতে রুচিবিকৃতি দেখা যায় ।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পুরানো যুগের আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে ছিলেন তথাপি নিজস্ব একটি বিশেষত্ব তাঁর ছিল । ভারতচন্দ্রের রচনারীতি থেকে তাঁর নিজস্ব একটি আলাদা রীতি ছিল । তাঁর পূর্ববর্তী কবিরা কাব্যের মধ্যে দিয়ে দেবদেবীর মাহাত্ম্যকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু ঈশ্বরগুপ্ত প্রথম দেখালেন যে দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা ছাড়া ও

কবিতার বিষয়বস্তু রাজনৈতিক , সামাজিক , এবং দৈনন্দিক ঘটনাও হতে পারে । ঈশ্বর গুপ্তের আগে কাব্যের বিষয়বস্তু এ সব হতে পারে এ কথা কেউ ভাবেন নি ।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে শ্লেষ ও বাগবৈদগ্ধ আছে । রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন 'স্মিত পরিহাস' । তবে তাঁর কাব্যে সমাজ বা ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ ছিল না । গতানু - গতিক বিষয় ব্যতীত ঈশ্বরগুপ্তের অভিনব বিষয়বস্তুর সঙ্গে খাঁটি বাঙ্গালী রসিকতার মিশ্রণে এই বিদ্রুপ - ভঙ্গির উদ্ভব হয়েছে । তৎকালীন পরিবর্তনশীল কলকাতা নিয়ে ঈশ্বরগুপ্ত লিখেছেন —

ধন্য ধন্য কলকাতা ধরেছে কলির ছাতা
ধন্য তব নব ব্যবহার ।
হইতেছে কত রঙ্গ নাহি মাত্র তালভঙ্গ
বঙ্গ - দেশ পদে নমস্কার ।।

(শারদীয় পর্ব ১৮৫২)

রাম - প্রসাদ ভারতচন্দ্রের দুটি লক্ষণ ঈশ্বরগুপ্তের ভাষার মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি । তিনি ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার করেছেন প্রচুর পরিমানে । খাঁটি বাংলা বাক্‌রীতিরও ব্যবহার করেছেন । সব রকম কবিতাতেই ইনি ইডিয়ম ব্যবহার করেছেন । যেমন —

" লক্ষীছাড়া হও যদি খেয়ে আর দিয়ে । " (হিতমালা)

সাধারণের মুখের ভাষাকে তিনি তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন । ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় শ্লেষ এবং যমকের আতিশয্য দেখা যায় । যদি এদের বাদ দিতেন , যতিচিহ্নগুলি নিয়মিত ব্যবহার করতেন এবং শব্দগুলি সচেতন ভাবে নির্বাচন করতেন তবে উপন্যাসের চমৎকার গদ্যভাষা গড়ে উঠত । " আলালের ঘরের দুলাল " এই সরল বাংলায় লেখা ।

পঞ্চকল, পার্বিক চৌপদী —

রস তাপেহি বিনাশে পায় তপনে আপ শুকায়ে যায়

বঞ্চিয়ে মান রবে কোথায় রবে কোথায় ।

প্রেমদা বন্ধন সংসারেরি প্রমদ আকর আহ্লাদেরি

সতত রাখহ সযত্নে তায় স্মরণ প্রায় ।। (৬)

কলাবৃত্ত ছন্দেরও তিনি ব্যবহার করেছেন ।

চতুষ্কল পার্বিক —

ধাঁ ধাঁ গুড় গুড় বাজে নাগারা ।

বাজে রবাব মৃদঙ্গ দোতারা ।।

পয়দল কলবল ভূতল টলমল

সাজন দলবল অটল সোয়ারা । (৭)

মধ্যযুগে ছন্দের দিক থেকে ভারতচন্দ্রকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হয় । তিনি বাংলা ছন্দ, সংস্কৃতছন্দ রচনা করেছেন । ভাষা রচনাতেও তিনি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছেন । তিনি পারস্য ভাষাতে কবিতা রচনা করেছেন । তিনি শুধু "ভাষার তাজমহল" ই গড়েন নি, যুগের উপযোগী কাব্যসৃষ্টিও করেছেন । অনেকে মনে করেন তিনি রাজসভাসদ্ অন্যান্য পন্ডিত গণের সাহায্য গ্রহণ করেছেন । তবে প্রকৃত পক্ষে তা করেন নি । তিনি যা শিখেছেন সবই তাঁর নিজস্ব সম্পদ । সর্বসাধারণের জন্য তিনি "যাবণী মিশাল" ভাষা রচনা করেছেন ।

---

(৬) তদেব, রসমঞ্জরী, পীঠমর্দ্দ, পৃ : ৩৮০.

(৭) তদেব, অন্নদামঙ্গল, মানসিংহের যশোর যাত্রা, পৃ : ২৯৩.

সেকালের ইংরেজি শিক্ষিত কবিরা ঈশ্বরগুপ্তের ভাষাকে কেউ গ্রহণ করেন নি । বিহারীলাল ও দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুরের রচনায় ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাব আছে ।

ভারতচন্দ্র বাংলা ছন্দের নতুনত্ব নিয়ে আসেন । খাঁটি বাংলা মিশ্র কলা - মাত্রার ছন্দে নানা পদ গঠন ও মিলের কৌশল তিনি দেখিয়েছেন । তবে এইসব ছন্দো - বন্ধের নামকরণ করেন নি । (ৎ, ং এবং ঃ) ছাড়া প্রত্যেক বর্ণকেই একক হিসাবে গণ্য করেছেন ।

পয়ার —

গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশ জাত ।
পরমকুলীন স্বামী বন্দ্য বংশ খ্যাত ।।
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম ।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম ।। (১)

চৌপদী —

কোন্ ফুলে বঁধু পানকরে মধু হয়ে এলে যদু
পোড়াতে মোরে ।
আলতা কজ্জল সিন্দুর উজ্জ্বল জাগিয়া বিকল
নয়ন ঘোরে ।। (২)

---

(১) ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় - সাহিত্য পরিষৎ, অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা, ভাদ্র ১৩৫০ , পৃ : ১৫৭.
(২) তদেব , রসমঞ্জরী , প্রগল্‌ভা অধীরা , পৃ : ৩৫৮ .

দ্বিপদী + ত্রিপদী –

কোটাল জিজ্ঞাসা করে হীরার কথা না সরে ।
চোরের যে ছিন লুঠিয়া লইন
যে ছিন হীরার ঘরে ।। (৩)

দীর্ঘ দ্বিপদী + দীর্ঘ ত্রিপদী মিশ্রবন্ধ —

হায় রে বিধাতা নিদারুন
কোন্ দোষে হইলি বিগুণ ।
আগে দিয়া নানা দুখ মধ্যে দিন কত সুখ
শেষে দুখ বাড়ানি দ্বিগুণ ।। (৪)

একাবলী —

নারীর যৌবন বড় দুরন্ত ।
শরীরের মাঝে পোষে বসন্ত ।।
বিনোদ বিনানে বিনায়ে বেণী ।
পুরুষে দংশিতে পোষে সাপিনী ।।

ভারতচন্দ্রের ভারতী যোগ ।
যৌবনেতে কর যৌবন ভোগ ।। (৫)

---

(৩) তদেব , অন্নদামঙ্গল , মালিনী নিগ্রহ , পৃ : ২৫৪.
(৪) ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী , বঙ্গীয় - সাহিত্য - পরিষৎ , অন্নদামঙ্গল , বিদ্যার আপেক্ষ , ভাদ্র , ১৩৫০ , পৃ : ২৫৬.
(৫) তদেব , রসমঞ্জরী , যৌবন কথন , পৃ : ৩৮৮ .

না রবে প্রসাদগুণ , না হবে রসাল ।

অতএব কহি ভাষা যাবণী মিশাল ।।

সত্যপীরের দ্বিতীয় পাঁচালীতে ফকিরের মুখে তিনি যাবনী ভাষা বসিয়েছিলেন । বিদ্যাসুন্দর কাব্যে "ভাটের প্রতি রাজার উক্তি" এবং "ভাটের উত্তর" এই দুটি অধ্যায়েই তিনি খাঁটি যাবনী ভাষার ব্যবহার করেছেন । যেমন —

কায গয়া বরবাদ সবে অরু ভারতীকে

নহি ভেদ জনায়া ।। (৮)

ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করেছেন । এজন্য কবি প্রশংসা পেয়েছেন আবার নিন্দাও তাঁর ভাগ্যে জুটেছে ।

ঊর্ধ্বে ছুটে জটা ঘনঘটা জরজর ।

উছলিয়া গঙ্গাজল ঝরে ঝর ঝর ।।

গরগর গর্জে ফণী জিহি লক্ লক্ ।

অর্ধশশী কোটি সূর্য অগ্নি ধক্ ধক্ ।। (৯)

তাঁর এই শব্দ প্রলোভন লক্ষ্য করে রমেশ দত্ত ধিক্কারের সঙ্গে বলেছেন — "কেবল শব্দ ! শব্দ ! শব্দ ! অমিত কুমার বলেছেন —" শব্দের নেশা — অনেক সময় নিছক শব্দের মাতনামিতে পর্যবসিত হইয়াছে । " রাজনারায়ন বসু বলেছেন — সে ভাষা "চাঁচা ছোলা মাজাঘষা" । আবার অক্ষয় সরকার বলেন , — সে ভাষা "পরিষ্কৃত"

---

(৮) ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী , বসুমতী সাহিত্য মন্দির , ভাটের প্রতি রাজার উক্তি , পৃ : ৬৮ .

(৯) তদেব , শিবব্যাসে কথোপকথন , পৃ : ১০১ .

তাতে "হীরার ধার" , "শব্দ সমুদ্রের মহনদণ্ড" নিজের হাতে কবি নিয়েছেন । তিনি "বাগ্‌বিশারদ" , "বাক্যরসরাজ" । নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁকে "শাব্দিক কবি" বলে স্বীকার করেছেন । তিনি "কথার তাজমহল" তৈরী করেছেন । দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহারকে সুন্দর বলে মেনে নিয়ে আলোচনা করেছেন — ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর আদরনীয় হওয়ার মূল কারণ হ'ল তাঁর অপূর্ব শব্দ মন্ত্র । ভাবকে বাদ দিয়ে ভাষাকে প্রাধান্য দিলে ভারতচন্দ্রকে প্রাচীন কালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে গণ্য করতে হয় । তিনি উৎকৃষ্ট শব্দ - কবি । শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা অংশ উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন, " মহাদেবের যে ভৈরবসুন্দর চিত্রখানি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা কাব্য সাহিত্যে শীর্ষদেশে স্থান পাইবার যোগ্য । " ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিতে যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে । "ছলচ্ছল, টলটল, কলকল, তরঙ্গ" — এই ছত্রটিতে তরঙ্গের তিনটি গুণ নির্দিষ্ট হয়েছে । ছলচ্ছল — জলের প্রবাহ ব্যঞ্জক, টলটল — জলের নির্মলতাব্যঞ্জক, কলকল — জলের নিক্কনব্যঞ্জক । গঙ্গাতরঙ্গের এমন সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর বর্ণনা বোধ হয় আর কোন কবি দিতে পারেন নি ।

ভারতচন্দ্র ছিলেন ছন্দ নিপুন কবি । তিনি তাঁর কাব্যে পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, ছড়ার ছন্দ, সংস্কৃত ছন্দ, দেশী নানা ছন্দ ব্যবহার করেছেন । তাঁর রচিত ছন্দের উদাহরণ —

পয়ার — এই রূপে রামাগণ কহে পরস্পর ।
স্নান করি যায় সবে নিজ নিজ ঘর ।। (১০)

ত্রিপদী — কি হে মনোহর দেখিতে সুন্দর
গাঁথিয়ে সুন্দর মালিকা । (১১)

---

(১০) ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, বিদ্যাসুন্দর, সুন্দরের মালিনী সাক্ষাৎ, পৃ : ১৫ .

(১১) তদেব, বিদ্যাসুন্দর, মাল্য - রচনা, পৃ : ২০.

চৌপদী – বাসনা করয়ে মন পাই কুবেরের ধন

সদা করি বিতরন তুষি যত আশনা । (১২)

ছড়ার ছন্দ – গর গর গর গরজে ফণী ।

দপ দপ দপ দীপয়ে মণি ।।

ধক্ ধক্ ধক্ জ্বালে অনল ।

তর তর তর চাঁদমন্ডল ।। (১৩)

সংস্কৃত ছন্দ –

যদম্বু নাশিত্বং মলং মহামল : সুশীতলং

প্রযাতি নীচযার্পকং দদাতি নিত্যমুচ্চতাং ।

হরে : পদাব্জ নির্গতাং হরিত্বমেব দায়িনীং

নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্ত কল্প কারিণীং ।। (১৪)

ভারতচন্দ্রের কাব্য - ভাষা দ্বারা ঈশ্বরগুপ্ত বহুল পরিমানে প্রভাবিত হয়েছিলেন । গুপ্ত কবির রচনায় ভারতচন্দ্রের প্রভাব দৃষ্ট হয় শব্দা লংকার , শ্লেষ , যমক , অনুপ্রাসাদির ঘটায় । গুপ্ত কবি ভারতচন্দ্রকে পেয়েছিলেন আদর্শরূপে । ভাষার পারিপাট্য সাধনে তিনি ছিলেন ভারতচন্দ্রের শিষ্য । তাঁর রচনায় দেখা যায় কবিতার অর্থ অনেক সময় অলংকারের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে ।

সাহিত্য সমালোচকগণ গুপ্তকবিকে "যুগ সন্ধির কবি " বলেছেন । একদিকে তিনি পূর্বসূরীদের বিশেষ করে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের আদর্শে মিশ্রবৃত্ত রীতির বিচিত্র

---

(১২) ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী , বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ , ভাদ্র ১৩৫০
বিবিধ , বাসনা বর্ণন , পৃ : - ৩৯৯ .

(১৩) ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী , বসুমতী সাহিত্য মন্দির , অন্নদামঙ্গল ,
শিবকে অন্নদান , পৃ : ১০৩ .

(১৪) ভারতচন্দ্র - গ্রন্থাবলী , বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ , বিবিধ গঙ্গাষ্টক,
ভাদ্র , ১৩৫০ , পৃ : ৪০৭ .

ধ্বনিমিলের চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন । লঘু ছড়াগানের আদর্শে দলবৃত্তরূও স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করেছেন । অপরদিকে আধুনিক যুগের দূরপ্রসারী প্রভাব তাঁর রচনাতেই প্রথম সূচিত হয়েছে । ঈশ্বরগুপ্ত ভারতচন্দ্রের আদর্শে অক্ষর সংখ্যার সমতা রেখে মিশ্রবৃত্ত পয়ার - ত্রিপদী , একাবলী ইত্যাদি ছন্দে কাব্য রচনা করেছেন । অনুপ্রাস অলংকারে কাব্যকে মন্ডিত করেছেন । অন্যদিকে উচ্চারনের দিকে লক্ষ্য রেখে মিশ্রবৃত্ত রীতিতে ছন্দ রচনা করেছেন । রবীন্দ্রনাথ দলবৃত্ত রীতিকে বাংলা কাব্যে স্বাভাবিক ছন্দ বলে গণ্য করেছেন । গুপ্তকবি সহজভাবেই এই দলবৃত্ত ছন্দকে ব্যবহার করেছেন । তিনি রামপ্রসাদের যোগ্য উত্তরসূরী । ভাষা , আঙ্গিক ও ছন্দ অলঙ্করনে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের সঙ্গে আধুনিক কাব্য ধারার প্রবর্তক রঙ্গলাল মধুসূদনের সেতু বন্ধন করেছেন ।

ভারতচন্দ্রের মত ঈশ্বরগুপ্তও ছন্দ সচেতন কবি ছিলেন । গঠন পারিপাট্য ও ছন্দের নামকরণে সেটি বোঝা যায় । লঘু সুরের আমেজ ফুটিয়ে তুলতে তিনি লৌকিক দলবৃত্ত ছন্দের যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন । মধ্যযুগে বৈষ্ণব কবিরা ব্রজবুলি গীতে যে ছন্দ সৃষ্টি করেছেন ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের কিছু গীতে তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । ঈশ্বর - গুপ্তের কয়েকটি কবিতায়ও এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । ভারতচন্দ্রের মত গুপ্ত কবি তাঁর কাব্যেও গানে মিশ্রবৃত্ত ছন্দরীতি ব্যবহার করেছেন । ভারতচন্দ্রের চেয়ে তিনি অনেক বেশী দলবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার করেছেন । কলাবৃত্ত ছন্দেরও তিনি ব্যবহার করেছেন ।

মিশ্রবৃত্ত ছন্দ — সেই হয় পূজনীয় , বিদ্যা আছে যার ।
বিদ্যাহীন নর সেই , বৃথা জন্ম তার ।।
বিদ্বানের সমাদর , স্বদেশ বিদেশ ।
বিদ্যার নিকটে নাই , ইতর বিশেষ ।।

(হিত প্রভাকর - পদ্য) (১৫)

---

(১৫) ঈশ্বর গুপ্তের রচনাবলী , ২য় খন্ড , হিত প্রভাকর , পৃ : ১১.

পয়ারকে কবি পদ্য বলেছেন । ভারতচন্দ্রের আদর্শে তিনি বর্ণ বা অক্ষর সংখ্যার সঙ্গে সমতা রক্ষা করেছেন । মালঝাঁপ পয়ারে তিনি অনুপ্রাসের কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি করেছেন । যেমন —

মালঝাঁপ পয়ার — রনদক্ষ , দুইপক্ষ , করে পক্ষ , বুদ্ধ ।
জোটে জোটে , চোটে চোটে , ঠোঁটে ঠোঁটে , যুদ্ধ ।।
- -
মহা ক্রুদ্ধে , বাহুযুদ্ধে , নেচে উর্দ্ধে , ওঠে ।
হাঁকে হাঁকে , ডাঁকে ডাঁকে , ঝাঁকে ঝাঁকে ছোটে ।। (১৬)

ভারতচন্দ্র সচেতন ভাবে "যাবণী মিশাল" ভাষায় পদ্য রচনা করেছেন । সেখানে আরবী, পার্শী শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায় । রামপ্রসাদও তাঁর কবিতাগানে লৌকিক শব্দের ও চিত্রকল্পের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করেছেন । গুপ্তকবিকে তাঁদের যোগ্য শিষ্য বলা যেতে পারে । তৎকালীন ইঙ্গ - বঙ্গ সমাজে আরবী - পার্শীর সঙ্গে ইংরেজী শব্দের প্রবেশ ঘটেছিল । সমাজ সচেতন কবি এ জাতীয় শব্দকে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন ।

মানমদে বিবি সব হইলেন ফ্রেস ।
ফেদরের ফোলোরিস ফুটিকাটা ড্রেস ।।
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
হিপ্ হিপ্ হুররে ডাকে হোল ক্লাস ।
ডিয়ার ম্যাডাম ইউ টেক্ দিস্ গ্লাস ।। (১৭)

---

(১৬) তদেব , হিত প্রভাকর , পৃ : ৯১০

(১৭) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী , ১ম ও ২য় ভাগ একত্রে , বসুমতী সাহিত্য মন্দির , ইংরাজী নববর্ষ , পৃ : ৮৭০

হিন্দী শব্দের ব্যবহারও তাঁর কবিতায় দেখা যায় । কৌতুকরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ ভাষাকে তিনি ব্যবহার করেছেন ।

কো - হ্যায় , কো - হ্যায় , আবি , হিঁয়া আও , শালো ।
নেকালো নেকালো , এক্কো , জুতি - সে নেকালো ।।
গেধড়ু - হরোমজাদ্ , কাঁহাকো বজাৎ ? ।
হামারা সামনে আকে , কহে আসা বাৎ ।। (১৮)

ভারতচন্দ্রের অনুকরণে ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ তাঁর কবিতায় লক্ষ্য করা যায় ।

কট্ কট্ কটাকট্ টক্ টক্ টক্ ।
ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঢক্ ঢক্ ঢক্ ।।
চুপ্ চুপ্ চুপ্ চুপ্ চপ্ চপ্ চপ্ ।
সুপ্ সুপ্ সুপ্ সুপ্ সপ্ সপ্ সপ্ ।। (১৯)

একই শব্দ বারবার ব্যবহার , চালিত ক্রিয়াপদের ব্যবহার , গ্রাম্য শব্দের প্রয়োগ গুপ্ত - কবির রচনার বৈশিষ্ট । মিশ্রবৃত্ত এই বৈশিষ্ট্য তাঁর "বোকেন্দু বিকাস " নাটকে লক্ষ্য করা যায় । —

বুক ফেটে , রক্ত ওঠে মরুক্ মরুক্ মরুক্ ।
মুখে , রক্ত উঠে মরুক্ ।।
এখনই ওলাওঠা ধরুক্ ধরুক্ ধরুক ।
এসে , ওলাওঠা ধরুক্ ।। (২০)

---

(১৮) ঈশ্বরগুপ্তের রচনাবলী , ২য় খন্ড , হিত - প্রভাকর , পৃ : ৮৭.
(১৯) ঈশ্বরগুপ্তের গ্রন্থাবলী , ১ম ও ২য় ভাগ একত্রে , বসুমতী সাহিত্য মন্দির , ইংরাজী নববর্ষ , ভাদ্র , ১৩৫০ , পৃ : - ১৪৪.
(২০) ঈশ্বরগুপ্তের রচনাবলী , ২য় খন্ড , বোকেন্দু বিকাস নাটক , পৃ : ১৭৬.

কবি এখানে রীতির সংলাপে কলহপরায়ণা , গ্রাম্য নারীর বাক্‌ভঙ্গী ফোটাতে চেয়েছেন ।

লৌকিক দলবৃত্তের স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে গুপ্তকবির সহজাত প্রবণতা লক্ষিত হয় । শেষ , ব্যঙ্গধর্মী কবিতাগানে , ছড়া জাতীয় রচনায় রামপ্রসাদী ঢঙের গীতে এ ছন্দের ব্যবহার কবি করেছেন । —

জমি চুনচে , দিন গুণচে , কেবল বুনচে বীজ
দোহাই না শুনচে একটিবার ।
নীলের দাদন , তেঁসার গাদন , বাঁধন চমৎকার ,
করে ভিটে মাটি চাটি সার ।। (২১)

এসকল ছন্দ ছাড়াও ঈশ্বরগুপ্ত অনেক নতুন ছন্দ ব্যবহার করেছেন । মোহিনী , উন্মাদিনী , রণরঙ্গিণী , বীর বিলাসিনী , তরঙ্গ লহরী , পাঞ্চাল , চপলাগতি , সুরতরঙ্গিণী , বিশ্ববিমোহিনী , চম্পক , লতিকা , নবগ্রহ , প্রকৃতিচ্ছন্দ , অমৃতলহরী , কুসুমলতিকা , রসবিলাস , চিত্ররেখা ইত্যাদি । ভারতচন্দ্র খাঁটি বাংলায় ছন্দ রচনা করেছেন । ঈশ্বরগুপ্তের মত এত সব নামকরণ তাঁর ছন্দে ছিল না ।

" বোধেন্দু বিকাসে " ঈশ্বরগুপ্ত " ও কথা বলো না আর বলো না " এই গীতটির নাম দিয়েছেন প্রকৃতিচ্ছন্দ অর্থাৎ প্রাকৃত বা লৌকিক ছন্দ ।

সংস্কৃত উচ্চারন রীতিতে ছয় কলামাত্রার ছন্দ ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বে ছিল না । ঈশ্বরগুপ্ত সচেতন ভাবে এর ব্যবহার করেছেন তাও বলা যায় না । বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্তের শব্দপ্রীতির উদাহরণ দেবার জন্য দুটি কবিতা উদ্ধৃত করেছেন । " কে রে বামা বারিদ - বরনী " এবং " কে রে বামা ষোড়শী রূপসী " কবিতা দুটি বাংলা স্বরন কলামাত্রিকের

---

(২১) ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী , ১ম ও ২য় ভাগ একত্রে , বসুমতী সাহিত্য মন্দির , নীলকর , ভাদ্র ১৩৫০ , পৃ : ১৫১ .

ছয়কলামাত্রার দৃষ্টান্ত হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই দুটি কবিতায় ঈশ্বরগুপ্ত সংস্কৃত উচ্চারণ প্রভাব থেকে মুক্ত নন । যেমন —

কেরে , বামা , — বারিদবরণী ,
তরুণী ভালে ধরেছে তরণি ,
কাহারো ঘরণী , আসিয়ে ধরণী ,
করিছে দনুজ - জয় । (২২)

"বোধেন্দুবিকাস " নাটকটি ঈশ্বরগুপ্তের ছন্দ সাধনার সংহত রূপ । এই নাটকে তিনি কৃত্তিবাসী , জয়দেবী , রামপ্রসাদী তিন রকম ছন্দ নিয়েই পরীক্ষা চালিয়েছেন । ভারতচন্দ্রের মত তিনি মূল সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় রূপান্তরের চেষ্টা করেন নি । তবে পঙ্‌ক্তিটিকা এবং তোটক ছন্দে রচিত সংস্কৃত শ্লোক তিনি ব্যবহার করেছেন ।

ঈশ্বরগুপ্ত "হিন্দী দোঁহা " রচনা করেছেন । যেমন —

তীরথ্ বরৎ ছোড়্ দেও , দেও - পাতর্ পূজ যৎ ।
ধরম্ করম্ ভরম্ ছোড়ো , ছোড়ো শাস্ত্র যৎ ।।
যেত্তা ব্রাহ্মণ্ দুনিয়ামে , সব বড়া বজ্জাৎ ।
গল্‌মেডোরি , পেট্‌মে ছোরি , মুউমে ঝুটা - বাৎ ।। (২৩)

প্রাচীন কবিতা থেকে আধুনিক কবিতার বহিরঙ্গ পার্থক্যের একটি বড় লক্ষণ আধুনিক কবিতার পদবন্ধ বা স্তবক । প্রাচীন কবিতায় পদবন্ধ ছিল না । এই পদবন্ধ ইংরাজী সাহিত্য থেকে বাংলায় এসেছে । ঈশ্বরগুপ্ত তরুণ কবিযশ : প্রার্থীদের আমন্ত্রণ

---

(২২) ঈশ্বরগুপ্তের রচনাবলী , ২য় খন্ড , বোধেন্দু বিকাস নাটক , পৃ : ২৪৫ .
(২৩) তদেব , পৃ : ২০৮.

করতেন ইংরেজি থেকে বাংলায় কবিতা অনুবাদ করতে । সেই অনুবাদের সূত্রেই বাংলায় পদবন্ধ প্রচলিত হ'ল । (২৪)

ঈশ্বরগুপ্ত নিজেও এরকম অনুবাদ করেছেন । মোহিতলাল ঈশ্বরগুপ্তকে প্রথম বাংলা পদবন্ধ রচনার গৌরব দিয়েছেন ।

দেহ হয় ক্ষীণ ক্রমে দেহ হয় ক্ষীণ ।
কালের অধীন তুমি কালের অধীন ।।
ভবে আর রবে কত কাল যত হয় গত,
নিকট হতেছে তত মরণের দিন ।
কালের অধীন তুমি কালের অধীন ।। (২৫)

গুপ্তকবি ছন্দ ও অলংকার প্রয়োগে ভারতচন্দ্রকে অনুসরন করেছেন, আবার কখনো দেখা যায় তিনি ভারতচন্দ্রকে অতিক্রম করে গিয়েছেন । মাঝে মাঝে তাঁর গদ্যরূপ পদ্যের সঙ্গে মিশে গিয়েছে ।

" হে কুলেশ্বর সুশান্ত ! জীবনকান্ত ! শান্ত হও, কটুভাষি কু-কর্মান্বিত, কদাশয় কুটিল কদম্বের কটুকথায় কি হয় ? দাম্ভিকদিগের দম্ভই বল, মিথ্যা-বাদির মিথ্যাই বল এবং ধূর্ত, শঠ, বাচালবর্গের বাক্‌জাল ভিন্ন অন্যবল আর কিছুই নাই । " (২৬)

---

(২৪) Priya Ranjan Sen, Western Influence in Bengali Literature, 3rd Ed., 1966, P - 122.

(২৫) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী, ১ম এবং ২য় ভাগ একত্রে, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, তত্ত্ববোধ, ভাদ্র, ১৩৫০, পৃ : ১০৫.

(২৬) ঈশ্বরগুপ্তের রচনাবলী, ২য় খন্ড, বোধেন্দু বিকাস নাটক, পৃ : ১৮২.

গাঢ়বন্ধ মার্জিত ভাষার ' স্টাইলে ' ভারতচন্দ্র অতুলনীয় ।

তাঁর — বৎসর পনর ষোল বয়স আমার ।
ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগারো ভাতার ।।

কিংবা — সুয়া যদি নিম দেয় সেই হয় চিনি ।।
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি ।।

এই ধরনের পংক্তির সঙ্গে ঈশ্বরগুপ্তের লেখার ভঙ্গীর মিল আছে । ভারতচন্দ্র সচেতন শিল্পী। শব্দ ব্যবহারে তিনি সতর্ক । তাঁর ভাষা আর্টিস্টের ভাষা । ঈশ্বরগুপ্ত তাঁর তুলনায় "অশিক্ষিত" পটু । ভারতচন্দ্রের ভাষার পরিচ্ছন্নতা বেশী , গাঢ় বন্ধতাও বেশী , মার্জিত বৈদগ্ধ্যও অসাধারণ । সমগ্রভাবে দেখতে গেলে ঈশ্বরগুপ্তের প্রকাশ রীতিতে সংহত রসিকতা ও চাতুর্য থাকলেও কবিতাগুলি অতিকথন দুষ্ট এবং দীর্ঘ । ভারতচন্দ্রের পরিমান বোধ উচ্চতর শিল্পীর মত নিখুঁত । ঈশ্বর গুপ্ত রসিকতার রীতি কবিওয়ালাদের কাছ থেকে পেলেও তাঁর প্রকাশ ভঙ্গিমা ভারতচন্দ্রের ভাষাকে স্মরণ করিয়ে দেয় । ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় এমন একটি "এ্যাটিচুড" বা ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে যা তাঁর নিজস্ব । কবি মনের রঙ্গময় প্রতিক্রিয়ারই বর্ণনার প্রকাশ তাঁর কবিতাগুলি ।

বাক্যবিন্যাসে , ধ্বনির effect সৃষ্টিতে ও অলংকরন প্রক্রিয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র ভারতপন্থী । ভারতচন্দ্রের মত তিনি একই শব্দকে বিভিন্ন অর্থে বারবার ব্যবহার করে শব্দ বিন্যাস ও ধ্বনির দ্বারা বিশেষ বিশেষ ছবিকে বাস্তবায়িত করেছেন । এবং পাঠকের মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করেছেন । অনাবশ্যক বিদেশীশব্দ ব্যবহার করে আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা করেন নি । তিনি ইংরাজী শব্দ যা ব্যবহার করেছেন তা স্থান - কাল - পাত্র অনুযায়ী দু - এক জায়গায় অতিরিক্ত বলা চলে । তবে তা কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট নয় । শব্দ চয়নে ও

প্রয়োগে ঈশ্বরগুপ্তের সংযম অতিশয় প্রসংশনীয় । ঈশ্বরগুপ্তের লেখায় ভাবালুতা বা সৌন্দর্যপ্রিয়তার ছাপ কদাচিৎ মেলে তার কারণ সমাজের প্রতি তীব্র কটাক্ষতা তাঁর ছিল । এদিক থেকে তাঁকে Pope ও Dryden এর সঙ্গে তুলনা করা যায় । তিনি ছিলেন প্রকৃতি বিচ্যুত কবি । Lyricism এর দিকটা ছিল তাঁর কাছে অবরুদ্ধ । তিনি প্রগতিবাদী আন্দোলনের প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন ।

ভারতচন্দ্র তাঁর কবিতায় অসংখ্য প্রবাদবাক্য ব্যবহার করেছেন । তিনি বাংলা সাহিত্যের সেরা প্রবাদকার । কেবল উচ্চবর্গ নন, নিম্নবর্গও প্রবাদ ব্যবহার করেছেন । সেজন্য তিনি রাজসভার কবি হয়েও গণকবি । সমাজের বাস্তব প্রয়োজনকে, সমস্যাকে ও তার কার্যকর সমাধানকে সূত্রাকারে প্রকাশ করেই তিনি প্রবাদকার হয়েছেন । এই প্রবাদ ব্যবহারের বিশিষ্ট সাহিত্যিক কারণ — প্রবাদের দ্বারা ভাষা ও ভঙ্গীর প্রাণশক্তি বাড়ানো যায় । প্রবাদ সকলের জন্য, এতে স্থূলতা আছে । ভারতচন্দ্রের কাব্যে প্রবাদ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে । যথা — 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়' ।। 'হাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়' ।। 'মনের সাধন কিংবা শরীর পতন' ।। 'শিলা জলে ভাসিয়া যায়, বানরে সঙ্গীত গায়' ।। ইত্যাদি ।

ভারতচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঈশ্বরগুপ্ত ইডিয়মের ব্যবহার তাঁর কাব্যে করেছেন । যেমন —

'জলে নাহি তেল মিশে' ।। 'সে তো আর ঘোল খেয়ে গোল নাহি করে' ।।
'ঘাড়ে আর নাহি নয় মদনের ঝুঁকি' ।। 'জানেন কিঞ্চিৎ গুণ ভাঁড়ে মা ভবানী' ।।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেখি কবি সুকৌশলে নিজের নাম তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন । যেমন — 'ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে' ।। 'রচিনা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর' ।। 'এই ছলে কহিছে ভারতচন্দ্র রায়' ।। 'অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিল কবিবর । শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর' ।।

ভারতচন্দ্রের এই প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যে । ঈশ্বরগুপ্তও নিজের নাম তাঁর লেখায় ব্যবহার করেছেন । যেমন —

তুমি হে ঈশ্বর ঈশ্বরগুপ্ত , ব্যপ্ত ত্রিসংসার ।
আমি হে ঈশ্বরগুপ্ত , কুমার তোমার ।।

ঈশ্বরগুপ্ত তাঁর কবিতায় অনেক শিক্ষিত সমসাময়িকের মত আদিরসের ডিয়ান চড়ান নি । কবি ও কবিতার বিচারে তিনি মুড়ি - মিছরীর তফাৎ করতে পারেন নি । পানিনির মত তিনি একসূত্রে " শ্বানং যুবানং মঘবানমাহ " ।

ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর যাঁরা বাংলা কাব্যের আসরে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁরা কবিওয়ালা নামে খ্যাত । এঁদের বেশির ভাগই ছিলেন অশিক্ষিত এবং প্রায় সকলেই ভারত - চন্দ্রের অনুকরণ করেছেন বিকৃত মানসিকতা নিয়ে । ফলে এঁদের হাতে কাব্য ভাষার যে আদল গড়ে উঠলো তা প্রায় সর্বাংশেই অত্যন্ত নিম্নমানের , অশ্লীলতার পর্যায়ভুক্ত । দুর্ভাগ্যবশত ঈশ্বরগুপ্ত এঁদের সংস্পর্শে আসেন এবং ফলে তাঁর ওপর কবিওয়ালাদের কাব্যভাষার প্রভাব স্বাভাবিক কারনেই লক্ষ্য করা যায় ।

কবি দুই জাতীয় ছিল । এক শ্রেণীর কবি ছিলেন পাঁচালীগাণের কবি, অন্যশ্রেণীর কবি " দাঁড়াকবি " (২৭)

পাঁচালীগাণের কবি পঞ্চাবলীর সুরের অনুযায়ী গান করতেন । সে গানের বিষয়বস্তু শাক্ত ও বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল । মঙ্গল কাব্যের যুগের শেষদিকে এই পাঁচালী কবিদের আবির্ভাব হয়েছিল । " দাঁড়াকবি " রা এই পাঁচালী কবিদের পরবর্তীকালীন । পাঁচালী কবিকে কেউ কেউ আবার "পায়েচালি " বলতো । তাই দাঁড়াকবি

---

(২৭) " দাঁড়া " শব্দের অর্থ হ'ল বাঁধা পথটি । দাঁড়িয়ে গাওয়া হত বলে নাম হয়েছে দাঁড়াকবি ।

বলতে বোঝাত " একস্থানে দাঁড়াইয়া যে কবি গান গায় " । দুই আখ্যার শব্দের পরিবর্তন ঘটায় দাঁড়াকবি বলতে কেউ কেউ আবার " কবিওয়ালা " শব্দের সৃষ্টি করলেন । " কবিয়ান " একটি শুদ্ধ শব্দ এবং এর সৃষ্টি সংস্কৃত " কবিপাল " বা " কবিপালক " হতে । " কবি" শব্দটি সংস্কৃত , কিন্তু " ওয়ালা " ফার্সী প্রত্যয় । " কবিয়ান " পদ অপেক্ষা " কবিওয়ালা " পদটি সমাধিক প্রসিদ্ধ ও লোকপ্রিয় ।

প্রাচীন কবি - সংগীতের অনেকাংশ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত " সংবাদ প্রভাকর " পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে । ১২৬১ সালের ১লা অগ্রহায়ণ " সংবাদ প্রভাকর " পত্রিকায় ঈশ্বর - গুপ্ত লেখেন — " ১৪০ বা ১৫০ বর্ষ গত হইল , গোঁজলা গুঁই নামক এক ব্যক্তি পেশাদারি দল করিয়া ধনীদিগের গৃহে গাহনা করিতেন । * * * লালু নন্দলাল , রঘু ও রামজী এই তিনজন কবিওয়ালা উক্ত গোঁজলা গুঁই এর সঙ্গীত শিষ্য ছিলেন । " (২৮)

গোঁজলা গুঁইয়ের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে গুপ্তকবি যে মন্তব্য করেছেন তা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না । কারণ গোঁজলা গুঁইয়ের আবির্ভাব কাল ১৪০ বা ১৫০ বছর আগের ধরলে গোঁজলাগুঁইকে সপ্তদশ শতাব্দীর কবিয়ান বলে গণ্য করতে হয় । তবে এটাও মেনে নেওয়া যায় না কারণ সপ্তদশ শতাব্দীতে কবিগানের কোন অস্তিত্ব ছিল না । কারণ রঘুনাথের শিষ্য রাসুর জন্মকাল ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে , নৃসিংহের ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং লালু নন্দলালের শিষ্য নিতাই বৈরাগীর জন্মকাল ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে । এর থেকে অনুমান করা যায় রঘু , লালু - নন্দলাল এঁরা গোঁজলা গুঁইয়ের শিষ্য, জীবিত ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত । এর থেকে অনুমান করা যায় যে কবি সঙ্গীতের প্রারম্ভ কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই হবে ।

---

(২৮) History of Bengali Literature in the Nineteenth Century, Dr. S.K. De, P - 302

প্রাচীনতম কবিয়াল গোঁজলা গুঁইয়ের জন্মকাল যদি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হয় , তবে তখনও পর্যন্ত দেশে কোনও রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটে নি । এই রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পরবর্তী কালে এবং এর বহুপূর্বে কবিগানের উৎপত্তি হয়েছিল । বঙ্গদেশে রাজনৈতিক ভাগ্য বিপর্যয়ের বিশৃংখলার যুগে কবিগানের উৎপত্তি মেনে নেওয়া যায় না । কলকাতা শহরে ধনী ও সম্ভ্রান্ত আভিজাতবর্গের গৃহপ্রাঙ্গনে কবিগান সীমাবদ্ধ ছিল , একথা মেনে নেওয়া যায় না । (২৯) কলকাতার বাইরে ফরাসডাঙ্গা বা চন্দননগর , চুঁচুড়া , হুগলী , সপ্তগ্রাম ও বীরভূম - সিউড়ীতে যে কবিদের আখড়া ছিল এবং কবিগান গাওয়া হ'ত তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ।

কলকাতা শহরে ও শহরের বাইরে ধনী ব্যক্তিগণ এই লোকসাহিত্যের পৃষ্ঠ পোষকতা করতেন । সাহিত্যের অন্যতম সংস্করণ বলেই লোকোৎসব , লোকসংস্কৃতি ও লোক প্রমোদানুষ্ঠানে এর স্থান ছিল । পশ্চিমবঙ্গে যে সময়ে কবিগানের উৎপত্তি হয়েছিল , সে সময় সাহিত্য রচনার পরিবেশ অনুকূল বা প্রতিকূল কোনটাই ছিল না । নবাব বাদশাহরা তখন রাজত্ব করছিলেন এবং চারদিকে চলছিল অন্তর্বিপ্লব । গ্রাম্যজীবন তখন ছিল শান্ত । শহরে লোকোৎসবগুলি বেশ জাঁকজমক ভাবেই সম্পন্ন হ'ত । দোল , দুর্গোৎসব , রাস - বারোয়ারি প্রভৃতিতে পূজা অপেক্ষা লোকপ্রমোদানুষ্ঠানগুলি প্রাধান্য পেতো । পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে এর প্রসার ঘটে । এই কবিগান দানা বেঁধে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই দেশে অরাজকতা দেখা যায় । নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজের কলকাতা শহর আক্রমণ করেন । এরপর কলকাতা শহরের অভ্যুত্থান হয় , এর কিছু আগে শ্রীরামপুর , চন্দন নগরের অভ্যুত্থান হয়েছিল । এরপর বর্গীর হাঙ্গামাকাল (১৭৪০ খ্রী : — ১৭৫০ খ্রী :) । এই বর্গীর হাঙ্গামা শহরে ও গ্রামে বাঙ্গালীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে দশ বছরের মত ক্ষুন্ন করেছিল । শিল্প , সাহিত্য সবকিছুর ওপর এর

---

(২৯) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবি সংগীত ইত্যাদি দ্রষ্টব্য ।

প্রভাব পড়েছিল । কবিগানেরও এ সময় ভাঁটা পড়েছিল । তখন প্রাচীন কবিয়াল রঘুনাথ থেকে আরম্ভ করে রামজী দাস পর্য্যন্ত সকলে অস্ত গিয়েছেন । নতুন কবি রাসু - নৃসিংহ , নিতাই বৈরাগী , হরু ঠাকুর, ভবানী বণিক প্রভৃতির নাম শোনা যায় । পরবর্তীকালে রাম বসু , নীলু , রামপ্রসাদ , ভোলা ময়রা , এন্টনী ফিরিঙ্গী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন । পূর্ববঙ্গেও কয়েকজন তখন কবিগান আরম্ভ করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন — ময়মনসিংহের আমতলার লোচন কর্মকার , চাইরগতিয়ার হারাইল বিশ্বাস , তারাচাপুরের চণ্ডীপ্রসাদ ঘোষ, দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ , ঘাটাইলের হরেকৃষ্ণ নাথ , কাশীপুরের লোকনাথ চক্রবর্তী ও শক্তিরাস কাপালী প্রভৃতি ।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে উৎসব - অনুষ্ঠানে ও পালাপার্ব্বনে নানারকম আমোদ - প্রমোদ অনুষ্ঠিত হ'ত । পালাগান ও পটুয়া - সঙ্গীত তখন অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। মঙ্গলকাব্য , রামায়ণ , মহাভারত , পুরান প্রভৃতি কবিতাকারে গাওয়া হ'ত । পটুয়ারা দৃশ্যের পর দৃশ্য তুলি ও বর্ণের সাহায্যে এঁকে পট উন্মুক্ত করে একপদী , দ্বিপদী , ত্রিপদী , পয়ার প্রভৃতি ছন্দে কবিতাগুলিকে সুর দিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করত । চণ্ডীর ছলনা , বেহুলার বাসর , সীতাহরণ , মায়ামৃগ - হত্যা, দাতা - কর্ণ , সুভদ্রা - হরণ , কালীয় দমন প্রভৃতি পালা থাকত । পটুয়া সঙ্গীত ও পালাগানের আরেকটি রূপ ছিল । একে " সঙ্‌গান " বলা হ'ত । পালা - পার্ব্বন ও উৎসব অনুষ্ঠানে পটুয়ারা নানারকম পুত্তলিকা তৈরী করে বসিয়ে রাখত এবং তাদের সম্মুখে হাত - পা নেড়ে গান করত । এদের অঙ্গ - সংস্থাপন এবং বেশভূষায় হাসির উদ্রেক করত । পার্ব্বন বিশেষে ঝুমুর নাচ ও গান হত, পরবর্তীকালে ইহাই ভাঁড় নাচ রূপে প্রসিদ্ধ হয় । ধর্মঠাকুরের গাজন ও চৈত্রের চড়ক উপলক্ষে তর্জার চর্চা খুব জনপ্রিয় ছিল । দুর্গাপূজা ও রাসযাত্রা উপলক্ষে তখনকার সঙ্গীতজ্ঞরা প্রাচীন পাঁচালী গান গাইতেন , সান্ধ্য আসরে বাদ্যধ্বনির সঙ্গে সুরতান লয় সহ এই গান

গাওয়া হত । বৈষ্ণব - সাহিত্য , বাঙ্গলা মঙ্গলকাব্য , পৌরানিক সাহিত্যের প্রচুর ভাববস্তু এর বিষয়বস্তু ছিল ।

অষ্টাদশ শতকে মঙ্গলকাব্যের শেষযুগে কবিগানের উৎপত্তি হয় । পুরান , উপপুরান, মঙ্গলকাব্য , বৈষ্ণব পদাবলী ও মালসীগান এ গুলিই কবিগানের উৎস । কবিগানের রূপ বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি এর কয়েকটি বিশিষ্ট ধারা রয়েছে — যেমন (১) সখী সংবাদ - গোষ্ট - গৌরচন্দ্রী (২) মালসী - ডাকমালসী - নহরমালসী, আগমণী - বিজয়া (৩) তরজা , (৪) খেউড় (৫) আখড়াই (৬) বিচিত্র প্রসঙ্গ । এই কয়েকটি ধারার সমন্বয় বলে কবিগানকে ষড়ঙ্গ বলা যেতে পারে ।

সখী সংবাদ পর্যায়ে দেখা যায় বিরহ ও মাথুর বিষয়ক গান সর্বাধিক । এর একটি কারণ ইহা করুন - রসাশ্রিত ও বাকোবাক্যের ভাব এতে রয়েছে । অপর কারণটি হল তখনকার শ্রোতারা সখী সংবাদ বলতে মাথুর ও বিরহ বিষয়ক গান খুব পছন্দ করতেন। শ্রী কৃষ্ণের মথুরা গমন , মথুরার রাজা হওয়া , কুব্জার সহিত মিলিত হওয়া , অক্রুরের গমনাগমন , বৃন্দার গমনাগমন ও সংবাদ আদান প্রদানের জন্য মাথুর বিষয় গড়ে উঠেছিল। মাথুর গান মথুরাকে কেন্দ্র করে শ্রী রাধা ও শ্রী কৃষ্ণের বিচ্ছেদ বিষয়ক । শ্রী রাধার সব সময়ই শ্রীকৃষ্ণ বিরহ । বৃন্দাবনে শ্রী কৃষ্ণ থাকাকালীন শ্রীরাধা বহুবার বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করেছেন । শ্রী কৃষ্ণ হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থাতে শ্রীমতী যখনই বেদনা অনুভব করেছেন তখনই বিরহ মূর্ত হয়ে উঠেছে । শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে শ্রীরাধার মনে বিকার দেখা যায় এবং সখীরা শ্রীকৃষ্ণকে এনে মিলন ঘটানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন । তাঁরা কৃষ্ণের নিকট গমন করছেন আবার রাধিকার নিকট সংবাদ বহন করে আনছেন । এটাই বিরহের মূল কথা । দাঁড়াকবি - গানের সখী সংবাদ পর্যায় ছাড়া রয়েছে গোষ্ঠী ও গৌরচন্দ্রী । গোষ্ঠলীলা পর্যায়ে পড়ে দাঁড়া-

কবিগানের গোষ্ঠলীলা । শ্রী কৃষ্ণের বাল্যলীলা যশোদার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি , অক্রূর - দর্শনে যশোদার খেদ প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে । বাৎসল্য রসকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠের দুটি বিভাগ ছিল । যথা – পূর্ব গোষ্ঠ ও উত্তর গোষ্ঠ । আর গৌরচন্দ্রী পর্যায়ে কীর্তনের গৌরাঙ্গ বন্দনা বা গৌরচন্দ্রিকা দেখা যায় । গৌরচন্দ্রী বলতে শ্রীকৃষ্ণ বন্দনা বা গৌরাঙ্গ বন্দনাকেই আমরা বুঝি । গানে সাফল্য লাভের আশায় কোন কোন কবি কখনও কখনও গৌরচন্দ্রী গেয়ে কবিগান আরম্ভ করতেন ।

চন্ডীমঙ্গল , দুর্গামঙ্গল প্রভৃতি আখ্যায়িকামূলক মঙ্গলকাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে ক্ষীণ হয়ে লুপ্ত হতে আরম্ভ করেছিল । তারপর খন্ড - গীতি কাব্য রচনার মধ্যে লীন হয় অবশেষে এই খন্ডগীতিগুলি মালসী নামে অভিহিত হয় । এই মালসীগান পরবর্তী কালে উমাসঙ্গীত ও শ্যামাসঙ্গীত নামে পরিচিত হয় । এই মালসীগানের অন্তর্ভুক্ত উমা বিষয়ক শক্তিপদাবলীর মূল বাৎসল্য রস হলেও তা আগমনী বিজয়া পর্যায়ের সঙ্গীতে রূপায়িত হয়েছে। মাতা মেনকা গিরিরাজ হিমালয়কে ধরে কণ্যাকে আনার জন্য অনুরোধ করছেন , উমার দুর্দশার কাহিনী স্মরণ করে আক্ষেপ করছেন , কখনো উমাকে দেখে উল্লাস করছেন । ষষ্ঠী সপ্তমীতে কন্যাকে পিতৃগৃহে দেখে নিশ্চিন্ত, আবারনবমী ও দশমীতে কন্যার কৈলাস গমণ আসন্ন বুঝে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও শঙ্কিত । এই ধরনের সঙ্গীতের চারটি রূপই কবিগানে আগমনী - ষষ্ঠী , নবমী ও দশমী বা বিজয়া সঙ্গীতে গাওয়া হ'ত । 'মালসী ' নামে আখ্যাত দাঁড়া কবিগানগুলি "লহর মালসী " ও "ডাক - মালসী " নামে অভিহিত হয়েছে ।

অনেকে "তরজা " শব্দকে আরবী শব্দ মনে করেন । প্রাচীন বাংলায় ও ধর্মঠাকুরের উৎসবে যে "আর্যা ও তরজা " এবং "তর্জন - গর্জন " রূপ প্রমোদানুশীলন হ'ত তা শ্লেষ ও রঙ্গগানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । এখনও আমাদের দেশে চড়কের সময় ও ধর্মঠাকুরের উৎসবে

তরজার অনুশীলন হয় । চাপান ও উতোর দুদিক হতে দুই অংশ মিলে "তরজা" সম্পূর্ণ হয় । কবিগানের চতুর্থ অঙ্গ "খেউড়" ও অশ্লীল রসগান । তরজার মত খেউড়ও অত্যন্ত জনপ্রিয় ও প্রসিদ্ধ উপভোগ্য প্রমোদ । খেঁউড় বহুক্ষণ ধরে চলতে থাকলে শ্রোতাদের কটু গালিগালাজে পর্যবসিত হ'ত । কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতোম প্যাঁচার নকশায়" এর প্রমাণ রয়েছে । খেঁউড় দুই প্রকার ছিল । এক উপমা অলংকার মন্ডিত সরল আর দ্বিতীয়টি রূপক । দুই প্রকারের মধ্যেই শ্লেষ ছিল । এই "খেঁউড়" শব্দের উৎপত্তি "খেউর" থেকে । লৌকিক রসগানে অশ্লীলতার বীজ দেখা দিলে তা "খেঁউড়" হয়ে উঠত । তরজার মধ্যে যেখানে পৌরানিক প্রসঙ্গ এসে পড়ত সেখানে একাধিক চরিত্র নিয়ে কুৎসা শুরু হ'ত, এই কুৎসাও একপ্রকার "খেঁউড়" ছিল । লৌকিক চরিত্র উপলক্ষ্য করে সরল ও রূপক খেঁউড় বা রসগান ছাড়া তরজার মধ্যে যে "খেঁউড়" বা রসগানের আমদানী হ'ত তাকে মিশ্র খেঁউড় বলা হয় ।

গন্ধর্ব বেদ বা গান্ধর্ব বিদ্যার অনুশীলনকে বলে "আখড়াই" । আখড়ায় চর্চার বিষয় বলে একে "আখড়াই" বলে । "চন্ডীমন্ডপ" ও "হরিসভা" আখড়াগুলির কথা চিন্তা করলে বোঝা যায় গ্রামে গ্রামে ঐগুলি আড্ডাস্থল হয়ে ওঠার পূর্বে ছোট ছোট আখড়াই ছিল । এখানে সন্ধ্যায় গ্রামের পাঁচজন মিলিত হয়ে চন্ডীমঙ্গল থেকে কৃষ্ণমঙ্গল পর্য্যন্ত পড়তেন এবং সময় সময় পাঁচালী গানও গাওয়া হ'ত । সাহিত্যানুশীলনে চন্ডীর ও শ্রী কৃষ্ণের স্থান মুখ্য বলে পরিগণিত হত বলেই "হরিসভা" ও "চন্ডীমন্ডপ" আখড়ার উদ্ভব হয়েছিল । প্রাচীন বাঙলার আখড়া বলতে বোঝাত একটি দল যাতে তিন চারজন থেকে পাঁচ - ছয়জন পর্যন্ত গায়েন, বায়েন ও দোহার থাকত, বাদ্যযন্ত্র থাকত মৃদঙ্গ, মন্দিরা বা করতাল, বীন, একতারা, ত্রিতারা, সপ্ততারা, আশুরঙ্গিনী প্রভৃতি । অষ্টাদশ - ঊনবিংশ শতকে আমাদের আখড়াই - এর সঙ্গে ইউরোপীয় সঙ্গীতোপকরন বেহালা, কর্ণেট,

ক্লারিওনেট , জলতরঙ্গ , হারমোনিয়ম বা অর্গান যুক্ত হয়েছিল , আর মৃদঙ্গ ভেঙে ডানদিকে বাঁয়া বা বাঁয়া - তবলা পরিশিষ্ট - হিসাবে কাজ করত । অষ্টাদশ - ঊনবিংশ শতাব্দীর এই আখড়াই এর উপকরনের প্রায় অর্ধেক অংশ নিয়ে হাফ - আখড়াই এর সৃষ্টি হয়েছিল । কলুইচন্দ্র সেন ছিলেন টপ্পাগান ও হাফ - আখড়াই এর প্রবর্তক । এই হাফ আখড়াই বেশী দিন স্থায়ী হয় নি । থিয়েটার ও অপেরার প্রচলনের ফলে হাফ - আখড়াই অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায় । কবিগানের মধ্যে আখড়াই এর যে রূপটুকু পাওয়া যায় তাকে সঙ্গীর্তনের সহোদর বলে গণ্য করা যায় । আখড়াইকে সংশোধিত করে রূপ নিল কবিগান ।

কবিগাণের ষষ্ঠ অঙ্গ বিচিত্র প্রসঙ্গ । একে কবিরা ভনিতা বলেছেন । স্বদেশ , সমাজ ও সমকালের যে কোন দিক নিয়ে অথবা স্থানীয় কোন ব্যাপার নিয়ে এ ভনিতা শুরু হতে পারে। বিচিত্র প্রসঙ্গ অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট নয় তবে শ্লেষমন্ডিত । এতে কিছু কিছু মাধুর্য নিহিত থাকে তাই এর স্বাদ অম্লমধুর ।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে শাক্ত পদাবলী ও কবি গানের উদ্ভব হয় কলকাতার আশে পাশে , কলকাতায় ও গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে । কেউ কেউ বলেন যে বুযুর গান থেকে কবিগানের উদ্ভব ।

কবিগানের এই পরিমন্ডলের মধ্যে লালিত হয়ে ঈশ্বরগুপ্ত বিকশিত হয়ে উঠেছিলেন । সুতরাং কবিগান ও আখড়াই গানের প্রভাব তিনি কোনদিন কাটিয়ে উঠতে পারেন নি । কৈশোরে তিনি কবির দলে ও আখড়াই সমাজে গান বাঁধতেন । যৌবনে এবং প্রবীণ বয়সে কবি সেই প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি ।

কবিওয়ালারা ইংরাজী না জেনেও তাঁদের কবিতা ও গানের মধ্যে বহু প্রচলিত ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করতেন । ঈশ্বর গুপ্ত কলকাতার অভিজাত সমাজে বিচরণ করতেন । " সংবাদ প্রভাকর " সম্পাদনাকালে তিনি বহুজনের সংস্পর্শে আসেন এবং প্রচুর ইংরাজী শব্দ তাঁর কবিতার

মধ্যে ব্যবহার করেন । এর উদ্দেশ্য ছিল নিছক ব্যঙ্গ ও পরিহাস । যেমন – "ডোন্ট ক্যার হিন্দুয়ানী ড্যাম ড্যাম ড্যাম । " তিনি ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করেছেন ঠিকই তবে পরিমিত জ্ঞান না থাকায় ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে যে নবচেতনা আমাদের মনে সঞ্চায়িত হয় তার সম্যক পরিচয় লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না । ১৮২২ খ্রী : জননীর মৃত্যুর পর ঈশ্বরগুপ্ত মাতুলালয়ে বসবাস করতে থাকেন । এখানে এসে তিনি কবিগানের চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । ঠাকুর বাড়ীতে মহেশচন্দ্র দত্ত নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে প্রায়ই তাঁর মুখে মুখে কবিতাযুদ্ধ হ'ত । বাল্যকালের এই অভ্যাস ঈশ্বরগুপ্ত সারাজীবনে বর্জন করতে পারেন নি । ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কবিগানের আদর একেবারে লুপ্ত হয়েছিল । কিন্তু ঈশ্বরগুপ্ত কবিগানের জগতে একেবারে গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে খ্যাত হয়েছিলেন । এই কবি গানকে কেন্দ্র করে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয় । আখড়াই ও কবি সঙ্গীতের অবস্থা যখন শীর্ষে সেই সময় ঈশ্বরগুপ্ত কলকাতায় আসেন । রামনিধি গুপ্ত , হরু ঠাকুর ও রামবসু তখন জীবিত ছিলেন ।

উত্তর কলকাতায় বিশেষ করে পাথুরিয়া ঘাটা , শোভাবাজার , বাগবাজার , জোড়াসাঁকো , বড়বাজার প্রভৃতি অঞ্চলে আখড়াই ও কবির দল গড়ে ওঠে । এখানে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে ঈশ্বরগুপ্তের মাতুলালয়ের সঙ্গে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবার পরিচিত ছিলেন এবং এই ঠাকুর পরিবার কবিগানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন । এই পরিবারের যোগেন্দ্র-মোহন ঠাকুরের সহায়তায় "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকা প্রকাশিত হয় । এরপর নিধুবাবুর শিষ্য মোহনচাঁদ বসু ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে হাফ - আখড়াই সঙ্গীতের প্রবর্তন করেন ।

গঙ্গাচরন বেদান্ত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্যের লেখা থেকে কবিদলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের ভূমিকা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করতে পারি —

একদা শোভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে নিধুবাবুকে দিয়ে একটি নূতন ধরনের দল প্রস্তুত করালেন। একটি শোভাবাজারে এবং অপরটি বাগবাজারে। এই দলের মধ্যে মোহন চাঁদ বসু নামক একটি বালক প্রতিভার পরিচয় দিতে থাকে। ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় শোভাবাজারের দলে প্রবেশ করলেন। জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়া ঘাটা হতে তাঁর "প্রভাকর" পত্রে শ্লেষ ও ব্যঙ্গময় প্রবন্ধাদি লেখা চলতে থাকে।

তিনি —

"কে বলে ঈশ্বরগুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর ।
যাঁহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর ।। "

ইত্যাদি কবিতা লিখে নিজের নিরপেক্ষতার প্রমাণ করেন। (৩০) কিন্তু এবারেও নিধুবাবু, ঈশ্বরগুপ্ত এবং মোহনচাঁদ থাকা সত্ত্বেও শোভাবাজার দল পাথুরিয়া ঘাটার রামচাঁদ বাবুর দলের কাছে পরাজিত হয়।

গঙ্গাচরনের এই বর্ণনার মধ্যে কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। রাজা রাজকৃষ্ণ যখন কবির দল গঠন করেন তখন ঈশ্বরগুপ্তের "সংবাদ প্রভাকর" প্রচারিত। কিন্তু রাজকৃষ্ণের মৃত্যু হয় ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ শে আগষ্ট। সে সময় ঈশ্বরগুপ্ত এগারো বছরের বালক, কলকাতায় বসবাস করার জন্য সদ্য এসেছেন। গঙ্গাচরনের বর্ণনায় দেখা যায় মোহন চাঁদ বসু তখন বালক, তার প্রতিভা বিকাশোন্মুখ মাত্র। অথচ ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি যখন হাফ আখড়াই সঙ্গীতের প্রবর্তন করলেন তখন তিনি পূর্ণ প্রতিভা-সম্পন্ন। (৩১) গঙ্গাচরনের মতে " কে বলে ঈশ্বরগুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর " ...... এই উপলক্ষ্যে লেখা।

---

(৩০) আচার্য, গঙ্গাচরন বেদান্ত বিদ্যাসাগর, হাফ-আখড়াই সঙ্গীত সংগ্রামের ইতিহাস, ১৩২৬, পৃ: ১৬.

(৩১) বসু মনোমোহন, "মনোমোহন গীতাবলী", ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত", ভূমিকা, ১৮৮৭, পৃ: ।/-॥৵

"বাঙ্গালীর গান"- এ দুর্গাদাস লাহিড়ী লিখেছেন - এক সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হয় । তিনি সেই অমূলক সংবাদ উপলক্ষ্য করে প্রভাকরে একটি কবিতা লিখেছেন ।

" কে বলে ঈশ্বরগুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর ।
যাঁহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর" ॥

১৮৩০ খ্রী :"সংবাদ রত্নাবলী" পত্রিকা সম্পাদনা ত্যাগ করে ঈশ্বরগুপ্ত কটকে চলে যান । ১৮৩৬ - এ তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন । এ সময় ঈশ্বরগুপ্ত অভিজাত সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন । কলকাতায় এ সময় কবিগানের যথেষ্ট প্রচলন ছিল । ইংরেজি শিক্ষিত আধুনিক মনোভাবাপন্ন সমাজ এই কবিগানকে ভালো চোখে দেখেন নি ।

নব্য শিক্ষিতরা যে কবিগান পছন্দ করত না তার সাক্ষ্য আছে নব্যবঙ্গের মুখপত্রে —
"It is said that the idol is pleased to hear the vulgar expressions used in Kubees and other hateful songs and that in the presence of the females." (৩২)

এ সময় ঈশ্বরগুপ্ত কবিগানে সমান ভাবেই উৎসাহী ছিলেন । ১৮৪৩ এর কাছাকাছি সময়ে ঈশ্বরগুপ্তের সঙ্গে রঙ্গলালের পরিচয় হয় । (৩৩) রঙ্গলালের বয়স তখন ষোলো বছর । সম্ভবত ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাবেই রঙ্গলাল কবিগান রচনায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন । -" রঙ্গলাল গুপ্ত কবির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হওয়ায় কলিকাতার আভিজাত সম্প্রদায়ের অনেকেরই স্নেহদৃষ্টি আকর্ষন করিলেন । তরুণ বয়সেই তাঁহার অপূর্ব সঙ্গীত রচনা শক্তি-র পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া ছাতুবাবু ও লাটু বাবু রঙ্গলালকে তাঁহাদের কবির দলের কবি নিযুক্ত করিলেন ।" (৩৪)

---

(৩২) The Spectrator, 24th October, 1843.

(৩৩) ঘোষ মন্মথ নাথ, রঙ্গলাল, ১৩৩৬, পৃ : ৫২ ॥

(৩৪) ঘোষ মন্মথ, রঙ্গলাল, ১৩৩৬, পৃ : ৭৬, ছাতুবাবু এবং লাটু বাবুর আসল নাম যথাক্রমে আশুতোষ দেব এবং প্রমথ নাথ দেব । এঁরা বিখ্যাত রামদুলাল সরকারের পুত্র । ছাতুবাবুর মৃত্যু ১৮৫৬, ২৯ শে জানুয়ারী । লাটু বাবুর মৃত্যু ১৮৪১, ডিসেম্বর মাসে ॥

কবিসঙ্গীত রচনায় ঈশ্বরগুপ্তের কতখানি উৎসাহ ছিল তার আর - একটি কৌতূহলোদ্দীপক প্রমান আছে। ১৮৪৯ - ৫০ এ ঈশ্বরগুপ্ত উত্তরভারত ভ্রমণে বেরিয়ে-ছিলেন। ফিরে এসে সংবাদ প্রভাকরে তিনি লেখেন —

" শুনিতে পাই, একবার কাশীধামে হাফ আখড়াইয়ের আসরে গুরু শিষ্যে দ্বন্দ্ব হইয়াছিল। মনোমোহন নিজগুরু কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত গীতিরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কাশীর হাফ আখড়াইয়ে " শিষ্যবিদ্যাই গরীয়সী " হইয়াছিল। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মনোমোহনের গুনপনায় এরূপ প্রীত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, সেই সঙ্গীত ক্ষেত্রে স্বয়ং হারি মানিয়া শিষ্যের গৌরব ঘোষণা করিয়াছিলেন " ।। (৩৫)

যদিও ইংরেজি শিক্ষিত সমাজ কবিগানের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিল সে সময় ১৮৫০ - ১৮৬০ এর মধ্যে দক্ষিণ কলকাতাতে হাফ আখড়াইয়ের কয়েকটি দল গড়ে ওঠে। অবশ্য আখড়াইগানের চর্চা ১৮৩২ এ হাফ আখড়াইয়ের উদ্ভবের সময় থেকেই ক্ষয় পেয়ে অবশেষে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে কবিগান বলতে হাফ আখড়াইকেই বোঝাত। কালীঘাট এবং ভবানীপুরের দল ছিল অন্যতম। ১২৮৪ সালে গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "প্রাচীন কবিসংগ্রহ " প্রকাশ করেন। তাঁর ভূমিকায় তিনি ভবানীপুর এবং কালীঘাটের দলের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। ভবানীপুরের রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম দল গঠন করেন। সেই সময় কালীঘাটের দল গঠন করেন হরলাল হালদার, ঈশ্বরচন্দ্র হালদার, কালীচরণ হালদার এবং গঙ্গাচরন হালদার। এই ভবানীপুর এবং কালীঘাটের দলের গাহনা হয় রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। ভবানীপুরে দ্বিতীয়বার দল গঠন করে নারায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনারায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়,

---

(৩৫) বসু মনোমোহন, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, হিতবাদী, ৪ ঠা ফাল্গুণ, শুক্রবার, ১৩১৮ সাল, পৃ: ২৯০

আনন্দ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় , শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় , রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । এদের সঙ্গে কালীঘাট দলের গাহনা হ'ত দেব নারায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দুর্গাদাস ভট্টাচার্যের বাড়িতে । তারপর তৃতীয়বার ভবানীপুরের দল গঠিত করেন জয়নারায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় । গান রচনা করতেন জয়নারায়ণ এবং তাতে সুর দিতেন মথুরামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রধান গায়ক । মথুরা-মোহন মোহনচাঁদের মতোই বিখ্যাত সুরস্রষ্টা ছিলেন । ভবানীপুরের চতুর্থবার দল গঠন করেন বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় , ভোলানাথ রায় চৌধুরী , শ্রীমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং "প্রাচীন কবি সংগ্রহ " কার গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ।

ঈশ্বর গুপ্ত কালীঘাট ও ভবানীপুর দুই দলের গান রচনা করেছেন । গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লিখিত ভবানীপুরের দলে হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম নেই , তবে তাঁরও একটি দল সেখানে ছিল । এই দলে ঈশ্বরগুপ্ত তিনটি গান রচনা করেছেন । গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে , — ১২৫৪ সাল হতে ১২৬১ সাল পর্যন্ত ক্রমে হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবনে শারদীয় পূজার সময় উভয় দলের গাহনা হয় । এই উক্তি থেকে ভবানীপুরে ঈশ্বর গুপ্তের গান রচনা করার একটা সময় মোটামুটি আন্দাজ করা যায় । ১৮৪৭ - ১৮৫৪ সাল ছিল এই সময় । ১৮৫৪ এর ২২ শে নভেম্বরের সংবাদ প্রভাকর পত্রে বাগবাজার ও জোড়াসাঁকো দলের মধ্যে হাফ - আখড়াই সঙ্গীত সংগ্রামের বর্ণনা দিয়ে দুটি পত্র প্রকাশিত হয় । দ্বিতীয় পত্রটি থেকে বুঝতে পারা যায় বাগবাজার দলের বাঁধনদার ছিলেন ঈশ্বরগুপ্ত ।

বাল্যকাল থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত ঈশ্বরগুপ্ত কবিগানের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন । ঈশ্বরগুপ্ত রচিত কবিদলের নাম সহ হাফ - আখড়াই সঙ্গীতের একটি তালিকা তৈরী করা হল : প্রাচীন কবি সংগ্রহ ১২৮৪ , কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - সংগৃহীত গুপ্তরত্নোদ্ধার ১৩০১ এবং অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত গীতরত্নমালা ১৩০৩ মিলিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে ।

কালীঘাটের সখের দলে গীত —

১। "সলিলে কমল হয় সে । সদা সবে কয় "

গীতরত্নমালা , পৃ : ৫৬৪ , গুপ্তরত্নোদ্ধার পৃ : ২৪৭ , ভবানীপুর নিবাসী পার্বতী চরণ চক্রবর্ত্তীর বাটীতে কালীঘাটের দলে গীত মোহন চাঁদ বসুর সুর, প্রাচীন কবি সংগ্রহ , পৃ : ১২৬ , "রামনীলা " ।

২। "যতনে মন প্রাণ তোমায় দান করেছি , লো প্রাণ " ।

গুপ্তরত্নোদ্ধার , পৃ : ২৫১ , কালীঘাট নিবাসী মথুরা মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুর , প্রাচীন কবি সংগ্রহ , পৃ : ১৪৪ ।

৩। " এই দশা ঘটিল ক্রোধে শ্রীরাধার " ।

প্রাচীন কবি সংগ্রহ , পৃ : ১৫৬ , নেপাউ ভট্টাচার্যের বাড়িতে ভবানীপুরের দলে গীত , গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধরতার উত্তরে কালীঘাটের দলে গীত , ঈশ্বর - গুপ্তের উত্তর ।

ভবানীপুরে হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে গীত —

১। " এ দানি এ দানী সে ! কে গো ঐ ? আহা মরে যাই "

গীতরত্নমালা , পৃ : ৫৫১ , গুপ্তরত্নোদ্ধার , পৃ : ২৪১ , রামকৃষ্ণপুরে ভবানীপুরের দলে গীত , মোহনচাঁদ বসুর গীত , প্রাচীন কবি সংগ্রহ , পৃ : ১৩৫ ।

২। " বঞ্চিতা করে আমারে কালাচাঁদ জুড়ালে "

গীতরত্নমালা , পৃ : ৫১৫ , গুপ্তরত্নোদ্ধার , পৃ: ২৫০ , ত্রৈলোক্যনাথ ঠাকুরের দলে গীত , মোহনচাঁদ বসুর সুর , প্রাচীন কবি সংগ্রহ , পৃ : ১৩৭.

৩। "শ্রীকৃষ্ণের আশায় হয়ে নিরাশায় "

গীতরত্নমালা , পৃ : ৬৬২ , গুপ্তরত্নোদ্ধার , পৃ : ২৪৮ , হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে গীত , মোহনচাঁদ বসুর সুর , প্রাচীন কবিসংগ্রহ , পৃ : ১০৪ .

রসময় বসুর দলে গীত —

১। "ভানু উদয়ে নন্দালয়ে শ্রীদাম যায় "

গীতরত্নমালা , পৃ : ৫৫৯ .

২। "নিশি সুপ্রভাতে রাখালগণ , ঐ নন্দালয়ে " ।

গীতরত্নমালা , পৃ : ৩৫৪ .

উদয়চাঁদ দাসের দল —

১। "কৃষ্ণ শ্রীরাধার ধরে পদে , পদে ২ রসময় " ।

গীতরত্নমালা , পৃ : ৩৮৮ .

২। "কৃষ্ণ দেখে তোমার এ দুর্দশা ভগ্নদশা প্রাণ " ।

গীতরত্নমালা , পৃ : ৩৮৯ .

১৮৫৩ থেকে ঈশ্বরগুপ্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রভাকরে কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনী ও পদ প্রকাশ করেছেন । বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন ঈশ্বরগুপ্ত দশ বৎসর কাল নানা জায়গা ঘুরে এগুলি সংগ্রহ করেন । তিনি আরো বলেছেন যে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র এ বিষয়ে প্রথম উদ্যোগী । তিনি এ কাজে ব্রতী হলেন কেন এর কারণ তিনি নিজেই বলেছেন , এ সব গান লুপ্ত হতে চলেছে বলেই তিনি সংরক্ষণের প্রয়োজনীতা অনুভব করেন । প্রাচীন বাংলা কাব্য ও কবি জীবনকে রক্ষা করার একটা আন্তরিক আকুলতা তাঁর ছিল । "সংবাদ প্রভাকরে ' প্রকাশিত ঈশ্বরগুপ্ত প্রাচীন কবি সম্পর্কিত রচনাগুলির একটি তালিকা তৈরী করা হ'ল —

ক) কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন — চারটি রচনা , ১৬ সেপ্টেম্বরের, ১৮৫৩ , ১৫ ডিসেম্বর ১৮৫৩ , ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৪ , ১৩ মার্চ ১৮৫৫ । এতে প্রসাদী সঙ্গীত - গুলি ছাড়াও আছে " সীতার বিলাপোক্তি সঙ্গীত " , " শিব সঙ্গীত " , " শবসাধন বিষয়ক সঙ্গীত " , " নৌকাখন্ডের সঙ্গীত " , কালীকীর্তনের গোষ্ঠলীলা ও রাসলীলা, কৃষ্ণকীর্তনের কয়েকটি পঙক্তি , আগমনী বিজয়া , ষট্‌চক্রভেদের গীত ।

খ) রামনিধিগুপ্তের জীবন চরিত — দুটি রচনা , ১৫ জুলাই , ১৮৫৪ এবং ১৬ আগস্ট , ১৮৫৪ ।

গ) রাসু নৃসিংহ — একটি রচনা , ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৫ ।

ঘ) হরু ঠাকুর — একটি রচনা , ১৫ ডিসেম্বর ১৮৫৪

ঙ) নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী— দুটি রচনা , ১৫ নভেম্বর ১৮৫৪ , ১৫ ডিসেম্বর ১৮৫৪ ।

চ) রাম বসু — চারটি রচনা , ১৬ ডিসেম্বর ১৮৫৪ , ১৬ অক্টোবর ১৮৫৪ , ১৫ নভেম্বর ১৮৫৪ এবং ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৫ ।

ছ) নবীকান্ত বিশ্বাস — একটি রচনা , ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৫ ।

জ) ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশ , ১৮৫৫ ।

ঝ) " প্রাচীন কবি " নামে তিনটি রচনা , ১৫ নভেম্বর ১৮৫৪ , ১৫ ডিসেম্বর ১৮৫৪ এবং ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৫ ।

ঈশ্বরগুপ্ত এক এক জন কবিকে নিয়ে এক একটি বই বের করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু ভারতচন্দ্রের জীবনী ছাড়া আর কোনটিই গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয় নি ।

এই কবিওয়ালাদের যুগের আবহাওয়ায় ঈশ্বরগুপ্ত লালিত এবং বর্ধিত হয়েছিলেন । কবিওয়ালাদের প্রভাব তাঁর রচনায় থাকলেও তাঁর নিজস্ব একটি বিশেষত্ব ও লক্ষণ ছিল । বঙ্কিম চন্দ্র বলেছেন যে ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় ভারতচন্দ্র রীতি থেকে আলাদা একটি রীতি ছিল । এই রীতিতে বাংলা ভাষা তেজস্বিনী হয়েছে । ঈশ্বরগুপ্তের আগে কেউ ভাবতে পারেন নি যে রাজনৈতিক , সামাজিক ও দৈনন্দিক ঘটনা কবিতার বিষয়বস্তু হতে পারে । এই অভিনবত্বের জন্যই ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা পাঠক সমাজকে আকৃষ্ট করেছে ।

কবির লড়াইয়ে উত্তর - প্রত্যুত্তর গান খুঁজে বের করতে তিনি উৎসাহীর পরিচয় দিয়েছেন । তিনি নিজেও উত্তর গান রচনা করেছেন । বিদ্বেষহীন ভাবে আক্রমণ করার যথেষ্ট সুযোগ এর মধ্যে থাকে । রঙ্গ - কৌতুক ঈশ্বরগুপ্তের বিষয় - পরিবেশনের প্রণালী বা ফর্ম । কবিওয়ালাদের থেকে পাওয়া হলেও এই ফর্ম তাঁর নিজস্ব । এই ফর্মকে কোন কবি কবিতার ক্ষেত্রে এমন সার্থকভাবে ব্যবহার করেন নি । কবিওয়ালারাও কৌতুক বা রসিকতাকে ঈশ্বরগুপ্তের মতো এতখানি সংহত আর্টে রূপ দিতে পারেন নি । উপমা, তির্যক বাগ্‌ভঙ্গিমা , পয়ার ছন্দ , যমক ও শ্লেষ অলংকার কাব্যের মধ্যে যেমন ভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন আর কেউ তা পারেন নি ।

কবিওয়ালাদের ভাষায় ও বর্ণনাভঙ্গিতে একটা সহজ অকৃত্রিমতা লক্ষ্য করা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র উত্তরাধিকার সূত্রে সেই ধর্ম্মটি পেয়েছিলেন । তীব্র বিদ্রুপ কটাক্ষের ভঙ্গিটি তাঁর নিজস্ব । তাঁর অধ্যাত্মবিষয়ক কবিতাগুলির ওপর কবিওয়ালাদের প্রভাব পড়েছে ।

কবিওয়ালাদের রস রুচিবোধ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা উন্নত নয় । কাব্যরস অপেক্ষা অরসিকের কুরুচির পরিচয় বেশী দেখা যায় । এই কুরুচি ও অশ্লীলতার প্রভাব

ঈশ্বরগুপ্ত পর্যন্ত বিস্তারিত হয়েছে । এই রুচি বিকৃতির জন্য কবিওয়ালাদের স্থূলরুচি বা যুগপরিবেশ কোনটি দায়ী সেটা লক্ষ্য করা দরকার । এমন যুগে এঁদের আবির্ভাব এবং এমন সব শ্রোতাদের মনোরঞ্জন এঁদের করতে হয়েছে যে ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক এঁদের রচনার মধ্যে কিছু ভেজাল দিতে হয়েছে । এই বিকৃত রুচির শ্রোতারা এতে সহজে মুগ্ধ হ'ত । তাই কবিওয়ালাদের গানের এই রুচি বিকৃতির জন্য দায়ী যুগ - পরিবেশ যতটা , কবিওয়ালারা কিন্তু ততটা দায়ী নন বা শ্রোতারাও নন ।

১৭৬০ - ১৮০০ পর্যন্ত কবিওয়ালাদের সমৃদ্ধির যুগ । আর ঈশ্বরগুপ্তের যুগ ১৮১২ — ১৮৫৯ পর্যন্ত । কবিগানের এই সমৃদ্ধির যুগে বাংলাদেশে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে , গোধূলি আকাশের পতঙ্গের মত কবিওয়ালারা বাংলা সাহিত্যের আসরে আকস্মিকভাবে উদিত হয়ে আবার আকস্মিক ভাবে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে । বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিওয়ালাদের স্থায়িত্ব দীর্ঘ কালের নয়। বাংলা কাব্যের দুর্যোগের দিনে কবিওয়ালারা অলঙ্কার , রসচেতনা প্রভৃতির দ্বারা বাংলা কাব্যের শুষ্ক প্রায় রসপ্রবাহটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন । আধুনিক বাংলা কাব্যের যথার্থ ভূমিকা কবিওয়ালাদের গানে । এই কবিওয়ালাদের সম্পর্কে ড : সুকুমার সেন বলেছেন যে — কোন কবিরই সৃষ্টি করার মত প্রতিভা ছিল না । গানের ভেতর দিয়ে তাঁরা অনেকটা অর্ধসচেতন ভাবে সাহিত্যের decadent বা ক্রমবিলীয়মান সুরটি রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন ।

ঈশ্বরগুপ্ত প্রাচীন কবিওয়ালাদের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি তবে কবিওয়ালাদের নিম্নরুচিকেও তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি । তাঁদের অশ্লীলতাকে মার্জিত ও শোধন করে তাকে সাহিত্যে রূপ দান করেন । বাংলা দেশে তখন নবজাগৃতির হাওয়া চলছিল এবং মানুষের মনে দুটি প্রবণতা দেখা দিয়েছিল — যথা ইংরাজিয়ানার প্রতি

বিরূপতা ও স্বজাতি প্রীতি । ঈশ্বরগুপ্তের কবিমানসেও এই দুটি প্রবণতা দেখা দিয়েছিল । তিনি ছিলেন Satirist. এই Satire রচনা করতে গিয়ে কবিওয়ালাদের ছড়াকে উন্নততর সংস্করণে সাজিয়ে দিয়েছেন । তাঁর লেখায় কবিওয়ালাদের অনুপ্রাস - যমক - শ্লেষ প্রচুর মাত্রাতে আছে, শব্দড়ম্বর প্রিয়তা এবং গ্রাম্যতা দোষও আছে ।

"হুতোম প্যাঁচার নক্সাতে" আমরা আখড়াই গানের উল্লেখ দেখতে পাই । এ ধরণের গানের সঙ্গে রামপ্রসাদের সময় থেকে শাক্ত গান প্রচলিত ছিল । ঈশ্বরগুপ্ত তাঁর বোধেন্দু বিকাস নাটকে শ্যামা বিষয়ক সঙ্গীতের অবতারণা করেছেন ।

কবি ঈশ্বরগুপ্ত ১৮৫৩ – ১৮৫৫ এর মধ্যে সংবাদ প্রভাকরে প্রাচীন কবি ও কবিওয়ালাদের জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন । কবি জীবনী যেটুকু প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর পরিকল্পনা ছিল তার থেকে অনেক বেশী । কবিওয়ালাদের সঙ্গে ঈশ্বরগুপ্তের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল । তাঁদের জীবনী ও গান সংগ্রহ করতে তাঁকে যথেষ্ট ক্লেশ স্বীকার করতে হয়েছে । কবি-ওয়ালারা কেউ প্রতিষ্ঠিত বা মর্যাদাসম্পন্ন ছিল না তাই তাদের জীবনী জানা যায় না । এই সব কবিগান কোনসময়ই পুঁথিবদ্ধ হয় নি । লোকের মুখে মুখে প্রচারিত ছিল । সুতরাং তথ্য এবং গান সংগ্রহ করতে ঈশ্বর গুপ্তকে গ্রামাঞ্চলে এবং অন্যত্র ঘুরে বেড়াতে হয়েছে । কেউ গান জানে শুনলে তিনি সেখানে গিয়েছেন এবং গানটি লিখে নিয়েছেন, তাও তিনি অনেক সময় সম্পূর্ণ গান পান নি । এজন্য ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ এবং নিধুবাবুর জীবনী যত বিস্তারিত এবং তাতে যত তথ্য আছে, কবিওয়ালাদের জীবনীতে তা নেই । তিনি যথাস্থানে উপস্থিত হয়েছেন এবং প্রত্যক্ষ করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, সনন্দ প্রভৃতি দলিল পরীক্ষা করেছেন অবশেষে কিম্বদন্তীর সাক্ষাৎ নিয়েছেন — এই গুলিই ছিল ঈশ্বরগুপ্তের গবেষণার পদ্ধতি । এ গুলি তিনি যদি না করতেন তবে কবিওয়ালাদের চিহ্ন সাহিত্যের পাতা থেকে লোপ পেতো ।

১৮৫৪ খ্রী : তিনি কবির দলে গান বেঁধেছেন । (৩৬) জনৈক অপক্ষপাতী সঙ্গীত সংগ্রাম দর্শীর বিবরণে তার প্রমাণ পাওয়া যায় । ঈশ্বরগুপ্ত পূর্ব ধারা অনুসরণ করে কবিওয়ালাদের প্রভাবে আগমনী গান রচনা করেছিলেন ।

অন্যদিকে তিনি ঠাকুরবাড়ির মতো সংস্কৃতি সম্পন্ন পরিবার ও সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে মেশবার সুযোগ পরবর্তীকালে পেয়েছিলেন । ফলে তাঁর কাব্যভাষাকে নতুন ভাবে গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হন ।

কলকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশের সঙ্গে ঈশ্বরগুপ্তের মাতুল বংশের পরিচয় ছিল। ১০ বৎসর বয়সে ঈশ্বরগুপ্ত মাতৃহীন হন । তারপর থেকে তিনি মাতুলালয়ে অবস্থান করতে থাকেন । কলকাতায় এসে ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে পরিচিত হন । পাথুরিয়া ঘাটারা গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে । ঈশ্বরগুপ্ত তাঁর সঙ্গে সবসময় থাকতেন এবং কবিতা রচনা করে খ্যাতি বৃদ্ধি করেন । যোগেন্দ্রমোহন ঈশ্বরগুপ্তের সমবয়সী ছিলেন । লেখাপড়া এবং জ্ঞানানুশীলনে তাঁর অনুরাগ ও যত্ন ছিল । ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে বাস করার ফলে তাঁর রচনাশক্তি জন্মেছিল । ঈশ্বরচন্দ্রের সৌভাগ্য ও যশের অবদান যোগেন্দ্রমোহনের ।" সংবাদ প্রভাকর " প্রকাশে তিনি যে শুধু তাঁর কাছেই ঋণী তা নয় , আরো অনেকের কাছেই ঋণী ছিলেন , পাথুরিয়া ঘাটার ঠাকুর বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোপীমোহন ঠাকুর । ঈশ্বরগুপ্ত কলকাতায় স্থায়ীভাবে আসার পূর্বে তিনি পরলোক গমণ করেন ১৮১৮ খ্রী : । ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় জোড়াসাঁকোয় মাতুলালয়ে আসেন ১৮২২ খ্রী : । গোপীমোহনের ছয় ছেলে — সূর্যকুমার , চন্দ্রকুমার , নন্দকুমার ,

---

(৩৬) দত্ত , শ্রী ভবতোষ , "কবিজীবনী " , ঈশ্বরগুপ্ত , ক্যালকাটা বুক হাউস , প্রথম সংস্করণ ১৯৫৮ , পৃ : ৩৬২.

কালীকুমার , হরকুমার এবং প্রসন্নকুমার । গোপীমোহনের তৃতীয় পুত্র নন্দকুমারের পুত্র ছিলেন যোগেন্দ্রমোহন । তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের সংবাদ প্রভাকরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । তাঁরা সমবয়স্ক ছিলেন । ১৮৩২ এর গোড়ারদিকে তিনি মারা গেলে ঈশ্বরগুপ্ত " সংবাদ প্রভাকর " সম্পাদনা ছেড়ে দেন । ঈশ্বরগুপ্ত যখন ঠাকুর পরিবারের সান্নিধ্যে আসেন তখন গোপীমোহনের পুত্র সূর্যকুমার ছাড়া আর সকলেই জীবিত ছিলেন । পাথুরিয়া ঘাটার ঠাকুর পরিবার বিদ্যা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকরূপে খ্যাতি অর্জন করেছিল । গোপীমোহনের পঞ্চম পুত্র হরকুমার ঠাকুর সংস্কৃত সাহিত্যে এবং শাস্ত্রে সুপন্ডিত ছিলেন । তাঁর দুই পুত্র যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাম সুপরিজ্ঞাত ।

গোপীমোহন ধনবান এবং সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । তাঁর বাড়িতে নানা অঞ্চল থেকে গায়কদের সমাবেশ হত । দেবক্রমে ঈশ্বরগুপ্ত এই ঠাকুরবাড়িতে আসেন । সেখানে তিনি এই গায়কদের সান্নিধ্য পান । পল্লীতে থাকাকালীন কবির দলে তিনি যোগ দেবার সুযোগ পেয়েছিলেন । এখানে এসে উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে তাঁর যথার্থ স্ফুরণ ঘটলো। লক্ষীকান্ত বিশ্বাস নামক এক কবিওয়ালা গোপীমোহনের বৃত্তিভোগী ছিলেন । ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয় । তাঁর পুত্র বৈদ্যনাথ বিশ্বাস পিতার দল রক্ষা করেছিলেন । বৈদ্যনাথের পুত্র ছিল না , তাঁর দৌহিত্র দর্পনারায়ণ দল চালিয়েছিলেন । লক্ষীকান্ত বিশ্বাসের জীবনী লেখার আগেই দর্পনারায়ণের মৃত্যু হয় । লক্ষীকান্তের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরেরা নিয়মিত বৃত্তি পেতেন । ঈশ্বরগুপ্ত লক্ষীকান্তের পাঁচটি রচনা সংগ্রহ করেছেন । (৩৭)

---

(৩৭) এ প্রসঙ্গে লক্ষনীয় — সংবাদপ্রভাকর , ৩০ জুন ১৮৪৭ - এ প্রকাশিত দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ । তাছাড়া ১৮ মার্চ , ২৭ মার্চ , ৫ এপ্রিল , ১৮৪৮ এর রচনাগুলি বিনয় ঘোষের " সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র " ১ম খন্ড ৪০১- ১২ পৃষ্ঠায় সংকলিত হয়েছে ।

ঈশ্বরগুপ্ত কলকাতায় এসে কবির দলে যোগ দিয়ে সঙ্গীত রচনা চর্চা করে - ছিলেন । এসময় কলকাতায় কবিগানের খুব চল ছিল । বিখ্যাত কবিওয়ালা হরুঠাকুর , রামবসু , নীলুঠাকুর, ঠাকুরদাস সিংহ , ভোলা ময়রা , অ্যানটুনি ফিরিঙ্গী অনেকেই তখন জীবিত ছিলেন । কলকাতায় তখন অনেক কবির দল ছিল এবং কবিগানের আসর বসত। উত্তর কলকাতার ধনী পরিবার গুলির উৎসব অনুষ্ঠানে কবিগানের আসর কি রকম বসত তার একটি বিবরণ ইংরেজি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল । (৩৮)

নন্দলাল ঠাকুরের পুত্র যোগেন্দ্র মোহনের সাহায্যে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র সরকারের কাছে আবেদন করেন । ১৮৩১ খ্রী : ১১ই জানুয়ারি আবেদনের উত্তর আসে । সেই অনুসারে ২৮ শে জানুয়ারি (১৬ ই মাঘ , ১২৩৭ , শুক্রবার) সাপ্তাহিক পত্ররূপে সংবাদ প্রভাকর আত্মপ্রকাশ করে । কয়েক মাস পরে ১৮৩১ এর জুলাই মাসে ঠাকুর বাড়িতে একটি মুদ্রযন্ত্র স্থাপিত হয় । "সংবাদ প্রভাকর " প্রকাশে ঈশ্বরগুপ্তকে সাহায্য করেন প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ । ঈশ্বরগুপ্তের রচনাশক্তির পরিচয় পেয়ে যোগেন্দ্রমোহন তাঁকে অর্থ সাহায্য দিয়ে পোষকতা করেছিলেন । এরপর দেখা যায় ঈশ্বরগুপ্ত নিজেই সম্পাদক পদ ত্যাগ করেন এবং যোগেন্দ্রমোহণের মৃত্যু হয় । বন্ধুর মৃত্যুতে দু:খিত হয়ে তিনি পত্রিকা ছেড়ে দেন ।

পরবর্তীতে দেখা যায় ১৮৩২ সালের ১০ ই আগস্ট "সংবাদ প্রভাকর " পুনরায় প্রকাশিত হয় । এবার "সংবাদ প্রভাকর " সপ্তাহে তিনবার বের হয় । এই পর্যায়ে ঈশ্বর- গুপ্ত অর্থসাহায্যের জন্য পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ির কানাইলাল ঠাকুর এবং গোপাল চন্দ্র

---

(৩৮) বাংলা সাময়িক পত্র , ১৩৫৪, পৃ : ১৬ - ১৭.

ঠাকুরের কাছে গেলেন । তাঁরা বহুল বিত্ত প্রদান করেন । ১৮৩৬ - এ তিনি কটক থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন এ সময় থেকেই ঈশ্বরগুপ্ত অভিজাত সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন ।

১৮৩৮ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় । "তত্ত্ববোধিনী সভা "-তে তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন । দ্বিতীয় পর্যায় থেকে "সংবাদ প্রভাকরের " প্রতিষ্ঠা এবং বন্ধুমন্ডলী বৃদ্ধি পায় । এই ঈশ্বরগুপ্ত "সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা " , তত্ত্ব-বোধিনী সভা " , "হিন্দু থিয়ফিলানথ্রপিক সভায় " অভিশিক্ষিত সমাজের পরিচ্ছন্ন এবং প্রগতিমূলক কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হন । "বঙ্গভাষা প্রকাশিকা " (১৮৩৬) সভায় তিনি সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছেন । জানা যায় "নিষ্কর ভূমির কর দান" সম্পর্কে ঈশ্বরগুপ্ত নিপুন আলোচনা করেছেন । (৩৯) দ্বারকানাথ ঠাকুর সংবাদ প্রভাকরের হিতৈষী হন । তিনি পত্রিকাকে নানাভাবে সাহায্য করতেন । (৪০) জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ঈশ্বরগুপ্তের যোগ আরো ঘনিষ্ট হতে থাকে এবং ব্রাহ্মধর্মের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হতে থাকেন । রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অক্ষয়কুমার দত্ত সংবাদ প্রভাকরের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকেন । ঈশ্বর গুপ্ত অক্ষয়কুমারকে দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন ।

ঈশ্বর গুপ্ত পাষন্ডপীড়ন (১৮৪৬ , ২০ জুন) , সংবাদ সাধুরঞ্জন (১৮৪৭ , আগষ্ট) , সংবাদ প্রভাকর - তৃতীয় পর্যায় প্রকাশ করেন । নব্যবঙ্গদের দ্বারা

---

(৩৯) সংবাদ পত্রে সেকালের কথা , ২য় , পৃ : ৭৫২.

(80) Kishory Chand Mitra, Memoir of Dwarakanath Tagore, Calcutta, 1870, P - 11, Dwarakanath thoroughly appreciated the merits of Issur Chander Goopta, and accorded to him every assistance patronising largely the Probhakar and offering him valuable suggestions for the conduct of that paper.

প্রতিষ্ঠিত " সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভাতে " (১৮৩৮ খ্রী :) ঈশ্বরগুপ্ত যোগ দিয়েছিলেন । জ্ঞানোপার্জিকা সভার অন্যতম সদস্য দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সঙ্গে এখানেই তাঁর ঘনিষ্ট পরিচয় হয় । ঈশ্বরগুপ্ত ব্রাহ্মধর্ম ও তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন ।

১৮৩৮ খ্রী : থেকে দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর উপনিষদ অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করেন । তখন থেকে উপনিষদ চর্চা করার জন্য একটি সভার প্রয়োজন অনুভব করেন । দেবেন্দ্র নাথের সঙ্গে ঈশ্বরগুপ্তের পরিচয় " তত্ত্ববোধিনী সভা " স্থাপিত হওয়ার পূর্ব থেকে । ঈশ্বরগুপ্ত পত্রিকা পরিচালনার সময় পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন । দ্বারকা নাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর যোগ কবে থেকে হয়েছিল সেটা বলা যায় না । দেবেন্দ্র নাথের সঙ্গে ঈশ্বরগুপ্তের দৃষ্টিভঙ্গিগত ঐক্য ছিল । ১৮৩২ খ্রী : দেবেন্দ্র নাথ " সর্বতত্ত্বদীপিকা " সভা প্রতিষ্ঠা করেন । ইংরেজিয়ানার যুগে বাংলাভাষার সাহায্যে বিবিধ বিদ্যার আলোচনা দুঃসাহসিক কাজ ছিল , এই কাজ প্রথম করেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ।

পত্রিকা সম্পাদন ও সভাসমিতি উপলক্ষে দেবেন্দ্র নাথের সঙ্গে ঈশ্বরগুপ্তের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল । ১৮৩৯ - এ দেবেন্দ্র নাথ " তত্ত্ববোধিনী সভা " প্রতিষ্ঠা করেন , ঈশ্বরগুপ্ত তাতে যোগ দেন । " তত্ত্ববোধিনী সভা " প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৮৩৯ খ্রী : ৪ ডিসেম্বর ঈশ্বর গুপ্ত এই সভার শ্রেণীভুক্ত হন । " তত্ত্ববোধিনী সভা " যখন অনাড়ম্বর ভাবে দেবেন্দ্রনাথের বাড়িতে স্থাপিত হল তখন ঈশ্বরগুপ্ত তাতে যথাসাধ্য সাহায্য করেন । দেবেন্দ্র নাথ লিখেছেন — " এই সময় অক্ষয় কুমার দত্তের সহিত আমার সংযোগ হয় । ঈশ্বর-চন্দ্র গুপ্ত ইহাকে আনিয়া আমার সহিত পরিচয় করিয়া দেন । অক্ষয়বাবু তত্ত্ববোধিনী সভার

সভ্য হন ।" (৪১) ঈশ্বরগুপ্ত "তত্ত্ববোধিনী সভার" নামমাত্র সভ্য ছিলেন না । তিনি এর নানা আয়োজন ও অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন । ঈশ্বরগুপ্ত "দেশহিতৈষিণী সভা" স্থাপন করেছেন । জোড়াসাঁকোর কমলবসুর বাটীতে কয়েকবার সভা হয়েছিল । সেই সকল বারেই সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য লোকের আগমন হয়েছিল । ঠাকুর বাড়ির সংস্কৃতি সম্পন্ন পরিবেশ ঈশ্বরগুপ্তকে নতুনভাবে গড়বার সুযোগ দিয়েছিল । "সর্বতত্ত্বদীপিকা" সভাতে ধর্ম বিষয় নিয়ে আলোচনা হলেও দ্বারকানাথ সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য নানাবিধ নৃত্যগীত ভোজ - সভার আয়োজন করতেন । ইংরেজিয়ানার যুগে এই সভাতে ঈশ্বরগুপ্ত বাংলা ভাষার সাহায্যে নানা বিদ্যার আলোচনা করেছেন এবং দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন ।

সাংস্কৃতিক দিক থেকে ঠাকুর পরিবার ছিল ভিন্নপথগামী । তখনকার দিনে শিক্ষিত সমাজে ইংরাজি ভাষার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত ব্যাপক — কথাবার্তা, লেখাপড়া ও চিঠিপত্রে । বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হ'ত অন্দর মহলের মেয়েদের শিক্ষায়, তার প্রসার ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ । ঠাকুর পরিবারে বাংলা ভাষার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ ছিল । তাকে ব্যবহার করা হত সর্বত্র । "সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা" র গৌড়ীয় ভাষার উত্তমরূপে অর্চনার আদর্শ দেবেন্দ্র নাথ প্রয়োগ করে - ছিলেন নিজের পরিবারে । কথিত আছে তাঁর কোন জামাতা তাঁকে ইংরাজিতে পত্র লিখেছিলেন বলে তিনি তা না পড়েই ফেরৎ দিয়েছেন । এ আচরণ সে যুগের পক্ষে খুবই বিস্ময়কর । এর ফলেই পরিবারের সন্তানদের মাতৃভাষার ভিত সুদৃঢ় হয়েছিল, তাঁদের ভাষা এমন এক স্বতন্ত্রতা অর্জন করেছিল যাকে লোকে বলত "ঠাকুর পরিবারের ভাষা" । শুধু ভাষাই নয় — বেশভূষা, আদব কায়দা, চালচলনে তাঁরা ছিলেন স্বতন্ত্র । এই স্বাতন্ত্রকে বলা যায় সাংস্কৃতিক আভিজাত্য ।

---

(৪১) ঠাকুর, দেবেন্দ্র নাথ, আত্মজীবনী, সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত, প্রকাশক শ্রী কানাই সামন্ত, ৪র্থ সংস্করন, ১৮১৮, পৃ: ২৬ ॥

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল উপনিষদের মধ্যদিয়ে প্রাচীন ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্টতা। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সন্তানদের ছোটবেলা থেকে বিশুদ্ধ উচ্চারনে উপনিষদের নির্বাচিত শ্লোক নিয়মিত আবৃত্তি করা প্রায় আবশ্যিক করে দিয়েছিলেন। আর তারই পরিনতি ঘটেছিল স্বদেশের প্রতি গভীর প্রীতিবোধের উন্মেষে। পরবর্তীকালে এই স্বদেশপ্রীতিই তাঁদের বিচিত্র চিন্তা ও কর্মের গভীর নিয়ামক শক্তি রূপে কাজ করেছিল। তখনকার দিনে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য - রথী — ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির ঠাকুরবাড়িতে আনাগোনা ছিল। এসব মিলে ঠাকুরবাড়ির আবহাওয়ায় একটা সাহিত্যরস সম্ভোগের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল।

রামমোহনের সময় থেকেই ব্রাহ্মসমাজে ধর্মচর্চার সঙ্গে সঙ্গে একটা সাংগীতিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। কৃষ্ণ ও বিষ্ণু চক্রবর্তী ব্রাহ্মসমাজের বেতন ভোগী গায়ক ছিলেন। রামমোহন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের কাঠামোয় বেশ কিছু "ব্রহ্মসংগীত" রচনা করেছেন। পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ এই ঐতিহ্য বজায় রেখেছিলেন এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও গণেন্দ্রনাথ হিন্দীগান ভেঙ্গে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনায় যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছেন। যদু ভট্টর মতো নামী সঙ্গীত শিল্পীরা জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে বসবাস করেছেন। এর ফলে তখন সেখানে একটি বিশুদ্ধ সাংগীতিক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল।

বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের স্মৃতি অবিস্মরনীয়। বাংলাদেশে বাঙালীদের মধ্যে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অনুশীলন ও চর্চা শুরু হয় ঠাকুর পরি - বারেই। বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশে নাট্যশালার দান বড় কম নয়। জোড়াসাঁকোর নাট্যশালাকে দেখলে আমরা তা অনুমান করতে পারি।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালার সঙ্গে পাথুরিয়া ঘাটা এবং বেলগাছিয়া নাট্যশালার ভূমিকা স্মরনীয়। এই নাট্যশালায় যতী-দ্রমোহনের নির্দেশে ঐকতানের সূত্রপাত। সৌরী-দ্র

মোহন ঠাকুর , ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় হিন্দু সঙ্গীতের ব্যাপক প্রচলন করলেন । বাঈজীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তখনকার বাবু সমাজে এদের পছন্দ করতেন খুব বেশী । জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় এসব সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয় , তার মধ্য দিয়ে বাংলার সংস্কৃতি ও সঙ্গীতের নবযুগের সূত্রপাত ।

ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করে সঙ্গীতের যে আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল তার দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছি । ইতস্তত : বিক্ষিপ্ত টুকরো টুকরো ছবি থেকে এই আবহাওয়ার ছবিটি আমরা দেখতে পাই । রবীন্দ্রনাথের "জীবন স্মৃতি " থেকেই শুরু করা যাক্ —

"জীবন স্মৃতি " —

ক) "সন্ধ্যাবেলায় রেড়ির তেলের ভাঙা সেজের চারদিকে আমাদের বসাইয়া সে রামায়ণ , মহাভারত শোনাইত । ..... এ হেন সংকটের সময় হঠাৎ আমাদের পিতার অনুচর কিশোরী চাটুজ্যে আসিয়া দাশুরায়ের পাঁচালি গাহিয়া অতিদ্রুত গতিতে বাকী অংশটুকু পূরণ করিয়া গেল , কৃত্তিবাসের সরল পয়ারের মৃদু মন্দ কলধ্বনি কোথায় বিলুপ্ত হইল — অনুপ্রাসের ঝকমকি ও ঝংকারে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম । " (ভৃত্য রাজকত-এ)

খ) "রবিবার সকালে বিষ্ণুর কাছে গান শিখিতে হইত । " (নানা বিদ্যার আয়োজন)

গ) " গান সম্বন্ধে আমি শ্রীকণ্ঠ বাবুর প্রিয় শিষ্য ছিলাম " । শ্রী কণ্ঠ বাবু)

ঘ) " সেই গীত গোবিন্দ খানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না । জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই , কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মধ্যে যে জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে "। (পিতৃদেব)

(ঙ) "আমার খুড়তুতো ভাই গনেন্দ্র দাদা তখন রামনারায়ণ তর্করত্নকে দিয়া নবনাটক লিখাইয়া বাড়িতে তাঁহার অভিনয় করাইতেছেন। সাহিত্য ও ললিত কলায় তাঁহাদের উৎসাহের সীমা ছিল না। বাঙলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক দিয়াই উদ্-বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।" (বাড়ির আবহাওয়া)

চ) "বেশ মনে পড়ে, বড়দাদা একবার কী একটা কিম্ভূত কৌতুকনাট্য (burlesque) রচনা করিয়াছিলেন – প্রতিদিন মধ্যাহ্নে গুনদাদার বড়ো বৈঠকখানাঘরে তাহার রিহার্সাল চলিত। আমরা এ বাড়ির বারান্দায় দাঁড়াইয়া খোলা জানালার ভিতর দিয়া অট্টহাস্যের সহিত মিশ্রিত অদ্ভুতগানের কিছু কিছু পদ শুনিতে পাইতাম এবং অক্ষয় মজুমদার মহাশয়ের উদ্দাম নৃত্যেরও কিছু কিছু দেখা যাইত।" (বাড়ির আবহাওয়া)

ছ) "সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চায়, বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন। ..... একসময় পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরী করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যেহই তাঁহার আঙুলি নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিশি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল। আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গানচর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাঁহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল"। (গীতচর্চা)

জ) "ব্রাইটনে থাকিতে সেখানকার সংগীতশালায় একবার একজন বিখ্যাত গায়িকার গান শুনিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার নামটা (Christina Nelson (1843 - 1922) Swedish Prima Donna Dame Albani (1852 - 1930) Canadian Prima Donna.....

জীবনস্মৃতি , বিলাতী সংগীত , রবীন্দ্র রচনাবলী (১৭শ খন্ড) বিশ্বভারতী সংস্করণ)

ভুলিতেছি — মাডাম নীলসন অথবা মাডাম আল্‌বানী হইবেন । .....

য়ুরোপীয় সংগীতের মর্মস্থানে আমি প্রবেশ করিতে পারিয়াছি । এ কথা বলা আমাকে সাজে না । কিন্তু বাহির হইতে যতটুকু আমার অধিকার হইয়াছিল তাহাতে য়ুরোপের গান আমার হৃদয়কে একদিক দিয়া খুবই আকর্ষণ করিত । আমার মনে হইত এ সঙ্গীত রোমান্টিক ।"

(বিলাতী সংগীত)

"ছেলেবেলা " থেকে —

ক) " আমাদের সময়কার কিছু পূর্বে ধনী ঘরে ছিল সখের যাত্রার চলন । মিহি গলাওয়ালা ছেলেদের বাছাই করে নিয়ে দল বাঁধার ধুম ছিল । আমার মেজকাকা ছিলেন এই রকম একটি সখের দলের দলপতি " ।

খ) " থিয়েটারে এসেছিলেন পেটে সোনার চেন ঝোলানো নামজাদার দল ..... ভদ্দর লোকেরা থাকে বলে বাজে লোক । "

গ) " বিলিতি সংগীতের গুণ হচ্ছে তার সুর সাধানো হয় খুব খাঁটি করে , কান দোরস্ত হয়ে যায় , আর পিয়ানোর শাসনে তালেও ঢিলেমি থাকে না । "

ঘ) " বৌ ঠাকরুন গা ধুয়ে চুল বেঁধে তৈরী হয়ে বসতেন , গায়ে একখানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা , বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি , আমি ধরতুম চড়া সুরের গান । "

"ঘরোয়া " থেকে —

ক) " রোজ জলসা হত বাড়িতে । রবিকাকা গান রচনা করতেন । আমি তখন তাঁর সঙ্গে বসে তাঁর গানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে এস্‌রাজ বাজাতুম " ।

খ) "অশ্রুমতীর এই সব গানে সব মাত করে দিল । এই গানটায় সুর দিয়েছিলেন জ্যোতিকাকা , ইটালিয়ান ঝিঁঝিট । রবিকাকাও কয়েকটি গানে সুর দিয়েছিলেন বোধ হয় । বিলাতি সুরে বাংলা গান এ কথা মজা লাগে ভাবতে । "

"জোড়া সাঁকোর ধারে " থেকে —

ক) "গান বাজনাও হত । তখনকার দিনে মাইনে করা গাইয়ে থাকত বাড়িতে । "

খ) "এমনি তরো নাচ দেখেছিলুম সে আরেকবার । কর্নাট থেকে নাম করা বাঈজি আনিয়েছেন । খুব ওস্তাদ নাচিয়ে মেয়েটি । "

অভিজাত এই ঠাকুর পরিবারে হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের চর্চা একদিকে যেমন দেখা যায় , পাশাপাশি আরেক দিকে রয়েছে বাংলার দেশী সঙ্গীত । ঠাকুর পরিবারে পাশ্চাত্য সঙ্গীত চর্চার দিকটিও অনুধাবন যোগ্য ।

জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর পরিবারে যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করেছিলেন । সঙ্গীত চর্চা তিনি অনেকদিন ধরেই করছিলেন । নবনাটকের অর্কেস্ট্রা রচনা তারই পরিচয় । সত্যেন্দ্র - নাথের সঙ্গে বোম্বাই গিয়ে তিনি সেতার শেখেন ।

"জীবন স্মৃতি "র প্রথম পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায় —

"আমাদের পরিবারে গান চর্চার মধ্যেই শিশুকাল হইতে আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি । কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না " ।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে সংগীতের স্রোত প্রবাহিত হয় । দেবেন্দ্রনাথ ছোটবেলায় সাহেব শিক্ষকের কাছে পিয়ানো শিখেছেন । পরে ওস্তাদের কাছে গান বাজনার চর্চাও করেছেন । রামমোহনের সময় থেকে হিন্দীগানের সুরে বাংলা কথা বসিয়ে ব্রহ্মসংগীত রচনার যে প্রথম সূত্রপাত , দেবেন্দ্র নাথের সময়ও তা অব্যাহত ছিল । তাঁর পুত্রেরা দ্বিজেন্দ্রনাথ ,

সত্যেন্দ্র নাথ , হেমেন্দ্র নাথ , জ্যোতিরিন্দ্র নাথ – সকলেই নিষ্ঠার সঙ্গে সংগীত রচনা করেছেন । জামাতা সারদাপ্রসাদ বিখ্যাত সেতারী জুয়ালা প্রসাদের কাছে সেতার শিখতেন । দেবেন্দ্র নাথ ও তাঁর পুত্রদের রচিত অনেক গানে বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী সুর দেন । কিংবা তাঁর প্রদত্ত অনেক হিন্দী গানের সুরে কথা বসিয়ে তাঁরা ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন । ইনি ঠাকুর পরিবারের সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন ।

যদুভট্ট দেবেন্দ্রনাথ ও গনেন্দ্রনাথের পরিবারে মাসিক বেতনের বিনিময়ে সংগীত শিক্ষা দিতেন ।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — "ছেলেবেলায় আমি একজন বাঙালি গুণীকে দেখেছিলাম ..... তিনিই বিখ্যাত যদু ভট্ট ..... যখন আমাদের জোড়া - সাঁকোর বাড়িতে থাকতেন , নানাবিধ লোক আসত তাঁর কাছে শিখতে , কেউ শিখত মৃদঙ্গের বোল , কেউ শিখত রাগ রাগিনীর আলাপ ।" .....

ঠাকুর বাড়ির আবহাওয়া ছিল সাহিত্য , গান , অভিনয় প্রভৃতি আনন্দ কোলাহলে ভরপুর । সাহিত্য ও কলাসৃষ্টির নৈপুণ্য বা সমঝদারি এ গুলি ছিল ঠাকুরবাড়ির লোকেদের জন্মার্জিত ক্ষমতা । দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে একটা সাহিত্য চক্র গড়ে ওঠে, সেটা সংবিধান সম্মত নয় – সেটা মজলিস আড্ডা । ঠাকুরবাড়িতে গানের আবহাওয়া ছিল বললে যথেষ্ট হয় না – ছিল গানের ও আর্টের একটা ভরপুর পাগলামি ।

ঠাকুরবাড়ির একটি পরিবেশের পরিচয় আমরা পাই – সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে , ছাদে জাজিমের ওপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে মেয়েদের মজলিস তখনো চলছে । বাড়ির পুরুষেরা তখন একে একে এসে সেখানে জুটতেন । মজলিস পুরোদমে জমে উঠত । গান শুরু হত । আমাদের বাড়িতে সেকালে গানবাজনা সব সময়ই চলত । বৈঠকখানা ঘরে

দাদা দ্বিপেন্দ্রনাথ ওস্তাদ নিয়ে আসর জমাতেন । তখনকার নামজাদা ওস্তাদরা তাঁর বৈঠকে সর্বদাই গান গাইতে আসতেন । রাধিকা গোস্বামী বাঁধা গাইয়ে ছিলেন ধ্রুপদ গাইবার জন্য । ড্রইংরুমে ছিল একটা গ্র্যান্ডপিয়ানো । জ্যোতিরিন্দ্র নাথ সেটা রাতদিন বাজাতেন — কখনো পিয়ানো ছেড়ে বেহালা ধরতেন, টুং টাং করে পিয়ানো বাজিয়ে গানের সুর বসানো তাঁর অভ্যাস ছিল । দিদিদের মধ্যে প্রায় সকলেই গান গাইতে পারতেন । ঘরে বাইরে সংগীতের আবহাওয়া বইত বললে যথেষ্ট বলা হয় না, বাড়ির সকলেই গান বাজনায় পাগল ছিলেন । সব সময়েই বাড়ির আনাচে কানাচে গান বাজনার মধুর আওয়াজ শোনা যেত ।

সন্ধ্যা হতে ছাদের মজলিসে দাদাদের সঙ্গে বাবাও এসে কখনো কখনো বসতেন, ... গানের এর চেয়ে উপযোগী পরিবেশই বা কোথায় মিলবে । প্রতিদিনই এই রকম গান চলত ।

বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্য জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একটা স্কুল ছিল । (৪২) জোড়াসাঁকো বাড়ির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নাটক রচনা ও অভিনয়ের একটা বড় স্থান ছিল ।

ঠাকুরবাড়ির এই সংস্কৃতি সম্পন্ন পরিবার ও সমাজের সঙ্গে ঈশ্বরগুপ্ত বর্ধিত হয়েছিলেন । ভারতচন্দ্রকে অনুসরণ করে বা কবিওয়ালাদের সংস্পর্শে থেকে যে ভাবে তাঁর মানসিকতা গড়ে উঠেছিল পরবর্তীকালে ঠাকুরবাড়ির সংস্পর্শে এসে সেই মানসিকতার উন্নতি হতে থাকে । তারপর থেকে তিনি নতুন মানসিকতা নিয়ে তাঁর কাব্য - ভাষাকে গড়ে তুলতে

---

(৪২) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পিতৃস্মৃতি, ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩, পৃ : ১৩.

থাকেন । প্রথমে তিনি যে সব কবিতা লিখেছেন , পরবর্তীকালের কবিতাগুলি তাঁর চেয়ে আলাদা । প্রথমে তিনি লিখেছেন সামাজিক ও ব্যঙ্গ বিষয়ক কবিতা এবং রসাত্মক কবিতা । যদিও বইতে প্রথমে স্থান পেয়েছে নৈতিক ও পারমার্থিক পর্যায়ের কবিতা । নৈতিক ও পারমার্থিক , প্রকৃতিবর্ণন, যুদ্ধ বিষয়ক ও বিবিধ কবিতাগুলি পড়লে বোঝা যায় তার মানসিকতা অনেক উঁচু স্তরের ছিল , অর্থাৎ সংস্কৃতি সম্পন্ন পরিবেশ তাঁকে এই ধরনের কবিতা লিখতে অনুপ্রেরণা দিয়েছে ।

ঈশ্বর চেতনা দেবেন্দ্রনাথের মনকে পরিপূর্ণ করে রেখেছিল । হিমালয় ভ্রমণকালে মহর্ষি অরণ্য প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করেছিলেন —

" আমার চক্ষু খুলিয়া গেল , আমার হৃদয় বিকশিত হইল । আমি সেই ছোট ছোট শ্বেত পুষ্পগুলির উপরে অখিলমাতার হস্ত পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম " । (৪৩)

দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যেও আমরা প্রকৃতি চেতনা লক্ষ করি ।

পূজা হোম জপ মন্ত্র নাহি জানি বেদ মন্ত্র
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুঁথি প্রকৃতি পড়ায় ।
কখনোপড়িনি শ্রুতি পেয়েছি যুগল শ্রুতি
শ্রুতির অধীন স্মৃতি স্মৃতি কেবা চায় ? (তত্ত্ব)

ঈশ্বরের লীলা পূজা অর্চনার দ্বারা উপলব্ধি করা যাবে না । প্রকৃতির মধ্যে এই লীলার অনুভূতি ঘটে । দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঈশ্বরগুপ্ত কাব্য রচনা করেছেন, কারণ মুগ্ধ নিসর্গপ্রীতির তেমন দৃষ্টান্ত তাঁর কবিতায় পাওয়া যায় না ।

---

(৪৩) ঠাকুর , দেবেন্দ্র নাথ , আত্মজীবনী , পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

ঈশ্বরগুপ্ত ব্রাহ্মধর্মে আনুষ্ঠানিক ভাবে দীক্ষা নিয়েছিলেন কিনা বলতে পারি না তবে তিনি ব্রাহ্মপদ্ধতিতে উপাসনা ও বক্তৃতা করেছেন ।

ঠাকুর বাড়ির সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবেশ তাঁকে কবিতা লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল ।

এই অধ্যায়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে প্রাক্ আধুনিক বাংলা কাব্যের ভাষার ঐতিহ্য যথাক্রমে ভারতচন্দ্রীয় ভাষা , কবিওয়ালাদের ভাষা সবই ঈশ্বরগুপ্তকে প্রভাবিত করেছিল। এঁদের দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁর নিজস্ব একটি গঠনশৈলী ছিল , সেই শৈলীতেই তিনি তাঁর কাব্য রচনা করেছেন ।